POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly

BADAR Qadian

Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 25

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা
৬০০ টাকা

বৃহস্পতিবার 18 June 2026 2 মুহাররম 1447 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيۡرًا مِّمَّا كُنۡتُمۡ تُخۡفُوۡنَ مِنَ الۡكِتٰبِ وَ يَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُوۡرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۱۶﴾ يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۱۷﴾

অনুবাদ:" হে আহলে কিতাব! আমাদের রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমাদের কিতারে মধ্য হইতে যাহা কিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহর কিট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

(সূরা মায়েদা. আয়াত: ১৬-১৭)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে ইসলামের বিশ্বজনীন বার্তা

عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَسْطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى اَبَلَّغْتُ؟ قَالُوْا بَلَّغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ : اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالُوْا : يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ : اَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قَالُوْا : شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ : ثُمَّ اَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قَالُوْا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ : فَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ، قَالَ : وَلَا اَدْرِيْ، قَالَ اَوْ بَلَدَكُمْ هٰذَا. اَبَلَّغْتُ؟ قَالُوْا : بَلَّغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

আবু নাজরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমাকে সেই ব্যক্তি বলেছেন যিনি মহম্মদ (সা.)-এর হজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ)-এর সেই খুতবা শুনেছিলেন, যা তিনি মিনার দিনগুলিতে-তে প্রদান করেছিলেন। I তিনি তাঁকে জানান যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ভাষণে বলেছিলেন:

"হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের উপাস্য এক, এবং তোমাদের পিতাও একজন। মনে রেখো, কোনো আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এবং কোনো অনারবের উপর আরবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে, কোনো লাল বা শ্বেতাঙ্গদের উপর কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এবং কৃষ্ণাঙ্গদের উপরও শ্বেতাঙ্গদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া ও পুণ্য। আমি কি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা উচ্চস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সত্যের এই বার্তা খুব সুন্দরভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।" এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কী দিন? লোকেরা বলল, "এটি একটি অত্যন্ত সম্মানিত দিন (হজের দিনসমূহ)।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কোন মাস? তারা বলল, "এটি একটি অত্যন্ত সম্মানিত মাস (জুল হজ্জ)।" এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কোন শহর? তারা বলল, "এটি একটি অত্যন্ত সম্মানিত শহর (মক্কা)।" তখন তিনি বললেন, "তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ-(বর্ণনাকারীর মনে নেই, তিনি সম্মানের কথাও উল্লেখ করেছিলেন কি না)-এতটাই পবিওত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন, যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহর পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। অর্থাৎ, যেমন তোমরা এদের পবিত্রতা লঙ্ঘনের কথা কল্পনাও করতে পার না, তেমনি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান লঙ্ঘন করাও অবৈধ।" এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন।" তখন তিনি বললেন, "যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন এই বার্তা তাদের কাছেও পৌঁছে দেয় যারা এখানে উপস্থিত নেই।"

(মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃ: ৪১১, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আল্লাহ তা'আলার দরবারে জাতি বা বংশগত পরিচয়ের কোনো মূল্য নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেছেন:

আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি (অর্থাৎ যার তাকওয়া বেশি)। "আমি সৈয়দ, "আমি মোগল, "আমি পাঠান" অথবা "আমি শেখ-এই ধরনের গৌরবের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেউ যদি উচ্চ বংশ বা জাতি নিয়ে গর্ব করে, তবে সেই গর্ব অর্থহীন। মৃত্যুর পর এসব জাতিগত ও বংশগত পরিচয় সবই বিলীন হয়ে যায়।

আল্লাহর সম্মুখে বংশ-মর্যাদা বা জাতিগত পরিচয়ের কোনো মূল্য নেই, এবং কেবল উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণের কারণে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ কে বলেছিলেন: "হে ফাতিমা! তুমি এ নিয়ে গর্ব করো না যে তুমি একজন নবীর কন্যা।" আল্লাহর নিকট বংশের কোনো গুরুত্ব নেই। সেখানে মর্যাদা লাভ হয় কেবল 'তাকওয়া'-র ভিত্তিতে।

এসব জাতি ও গোত্র কেবল জাগতিক পরিচয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয় 'তাকওয়া' দ্বারা, এবং 'তাকওয়া'-ই উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভের একমাত্র মাধ্যম। (সূত্র: আল-হাকাম, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৩৭, ১৭ অক্টোবর ১৯০২, পৃষ্ঠা ৭।

মনে রাখবেন!

হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের জুমার খুতবা ১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হবে।

জামাতের সদস্যগণএ অনুযায়ী হুযুর আনওয়ারের জুমার খুতবা নিজেরাও শুনুন এবং অন্যদেরকেও শোনানোর ব্যবস্থা করুন। (সম্পাদকীয় বিভাগ)

মহানবী (সা.) খৃষ্টান গোত্রকে মসজিদে ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছিলেন

হযরত মুসলেহ মওউদ তথা দ্বিতীয় খলীফাতুল মসীহ (রাঃ), ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আঁ হযরত (সা.)-এর ধর্মীয় সহনশীলতার কথা উল্লেখ করে বলেন:

"তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার উপর অত্যন্ত জোর দিতেন এবং নিজেও এ বিষয়ে সর্বোচ্চ মানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ণবসবহ থেকে একটি খ্রিস্টান গোত্র তাঁর কাছে ধর্মীয় আলোচনা করার জন্য এসেছিল। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় পাদ্রীও ছিলেন। তারা মসজিদে বসে আলোচনা শুরু করলেন এবং সেই আলোচনা দীর্ঘায়িত হলো। তখন সেই প্রতিনিধিদলের একজন পাদ্রী বললেন, 'এখন আমাদের উপাসনার সময় হয়ে গেছে, আমরা বাইরে গিয়ে আমাদের প্রার্থনা আদায় করে আসি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'বাইরে যাওয়ার কী প্রয়োজন? তোমরা আমাদের মসজিদেই তোমাদের উপাসনা সম্পন্ন করতে পারো। আমাদের মসজিদ তো আল্লাহর স্মরণের জন্যই নির্মিত হয়েছে।'

(সূত্র:দিবাচা তাফসীরুল কুরআন' (

কুরআনের তাফসীরের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪০৪।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিস ফির্কার মতপার্থক্য
-- এবং --
হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের হাকাম ও আদল হিসেবে ঈমানবর্ধক ফয়সালা

আজকাল সউদি আরব-কে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে খবর ছড়ানো হচ্ছে যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সৌদি আরব মুতাওয়াতির (বহুসূত্রে বর্ণিত) হাদিস ছাড়া বাকি সব হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অন্য সব হাদিসের উপর আমল করাকে সন্দেহজনক মনে করছে। কিছু মুসলিম মোল্লা ও তাদের সমর্থক, যারা দিনরাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের আবেগ উসকে দিয়ে সস্তা খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করে, এ ধরনের খবর ছড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাস্তবতা হলো, কয়েক বছর আগে সৌদি সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভিশন ২০৩০ নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তেলের আয়ের বাইরে এমন কী কী উপায় আছে, যার মাধ্যমে সৌদি আরব শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে। এর মধ্যে ছিল পর্যটন উন্নয়ন, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আধুনিক শহর ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ, নারীদের কর্মসংস্থান ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ইত্যাদি। এসব সংস্কারের মধ্যে কিছু ধর্মীয় সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার একটি হলো-আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদিস থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া, আর আহাদ ও খবর হাদিসকে নিম্নস্তরে রাখা।

এই বিষয়ে সৌদি সরকারের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য কিংবা অতিরঞ্জিত করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনকারী মোল্লাদের বক্তব্য একপাশে রেখে, আমরা এই যুগের প্রেরিত মির্জা গোলাম আহম) কর্তৃক পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদিস থেকে হিদায়াত লাভের বিষয়ে প্রদত্ত দিকনির্দেশনা তুলে ধরছি। আমরা বলি, মুসলিম উম্মাহ যেখানে যেখানে হোঁচট খেয়েছে এবং যেখানে যেখানে দিকনির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করেছে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে সেখানে সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁর জীবদ্দশাতেই আহলে কুরআন আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ চাকড়ালভী এবং গোলাম আহমদ পারভেজ-এর মতো ব্যক্তিত্বরা। এঁরা প্রায়ই আহলে হাদিস আলেমদের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিতেন। এমনই একটি বিতর্ক ১৯০২ সালে আবদুল্লাহ চাকড়ালভী এবং মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ চাকড়ালভী ও তাঁর অনুসারীরা কেবল পবিত্র কুরআনকেই মানতেন এবং হাদিসকে আমলের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করতেন না। অন্যদিকে, মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী-এর বিশ্বাস ছিল যে, হাদিস আল্লাহর কিতাব কুরআনের উপর বিচারকস্বরূপ। উভয় পক্ষই চরমপন্থায় চলে গিয়েছিল-এক পক্ষ বাড়াবাড়ির দিকে, আর অন্য পক্ষ অবহেলার দিকে।

এই বিতর্ক সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ রুহানী খাজায়েন, খণ্ড ১৯-এ অন্তর্ভুক্ত "রিভিউ বর মুবাহাসা বাটালভী ওয়া চাকড়ালভী শীর্ষক একটি পর্যালোচনা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গভীর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, যা আজও মুসলিম আলেম ও সরকারগুলোর জন্য অনুসরণযোগ্য।

তিনি বলেন:"আল্লাহ তোমাদের হিদায়াতের জন্য তিনটি জিনিস দিয়েছেন। প্রথমটি হলো কুরআন। দ্বিতীয় হিদায়াতের উৎস হলো সুন্নাহ-অর্থাৎ সেই পবিত্র আদর্শ যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কর্ম ও আমলের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। যেমন, তিনি নামাজ পড়ে দেখিয়েছেন কীভাবে নামাজ পড়তে হয় এবং রোজা রেখে দেখিয়েছেন কীভাবে রোজা রাখতে হয়। এটিই সুন্নাহ-নববী পন্থা, যা আল্লাহর বাণীকে বাস্তব কর্মের রূপে প্রকাশ করে।

হিদায়াতের তৃতীয় উৎস হলো হাদিস, যা তাঁর পর তাঁর বাণীসমূহ সংকলিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছে। হাদিসের মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহর নিচে, কারণ অধিকাংশ হাদিসই অনুমাননির্ভর (যান্নি)। তবে যদি সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তার নিশ্চিততা বৃদ্ধি পায়।" (কিশ্তীয়ে নূহ, পৃ. ৩৩-৩৪)

উক্ত বিতর্ক সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ আরও লিখেছেন:

"প্রকৃত বিষয় হলো, উভয় পক্ষই ভুল করেছে-এক পক্ষ বাড়াবাড়ি করেছে, অন্য পক্ষ ঘাটতি করেছে। প্রথম পক্ষ, অর্থাৎ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব, এ কথা ঠিক বলেন যে নির্ভরযোগ্য ও সংযুক্ত নববী হাদিসকে অর্থহীন বলে বাতিল করা যায় না। কিন্তু তিনি মর্যাদার সঠিক স্তর ভুলে গিয়ে হাদিসকে এমন উচ্চতায় উন্নীত করেন, যার ফলে পবিত্র কুরআনের অবমাননা ঘটে। এটি স্পষ্ট ভুল এবং ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুতি। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

'আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর আর কোন কথায় তারা ঈমান আনবে?'

অন্যদিকে, মাওলভী আবদুল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে হাদিস অস্বীকার করে ঘাটতির পথে গেছেন। এক অর্থে হাদিস অস্বীকার করা কুরআন অস্বীকার করার সমান। কারণ আল্লাহ বলেন:

'বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।'

যেহেতু আল্লাহর ভালোবাসা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তাঁর বাস্তব আদর্শ জানার অন্যতম মাধ্যম হাদিস-সুতরাং যে ব্যক্তি হাদিস ত্যাগ করে, সে নবীর অনুসরণের পথও ত্যাগ করে।"

অন্যান্য মুহাদ্দিস ও সমালোচকদের তুলনায় প্রতিশ্রুত মসীহ হাদিস যাচাইয়ের একটি স্বতন্ত্র নীতি উপস্থাপন করেন: যে হাদিস পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা সনদ দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য। বিপরীতে, যে হাদিস অত্যন্ত সহীহ বা মুতাওয়াতির হলেও যদি কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার বিরোধিতা করে, তবে প্রথমে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু মিল সম্ভব না হলে সেটি বর্জন করতে হবে, কারণ তা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর কথা হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, যদি কোনো হাদিসে এমন ভবিষ্যদ্বাণী থাকে যা মুহাদ্দিসরা দুর্বল বলেছেন, কিন্তু পরে ইতিহাসে তা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে সেই হাদিসকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং যারা সেটিকে দুর্বল বা জাল বলেছেন, তাদের ভুল স্বীকার করতে হবে। এ ধরনের শত শত হাদিস রয়েছে যাতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, এবং অনেকগুলোকে দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ বা জাল বলা হয়েছে। সুতরাং, যদি এমন কোনো হাদিস পূর্ণ হয় এবং কেউ শুধু পূর্বের দুর্বল শ্রেণিবিভাগের কারণে তা অস্বীকার করে, তবে সেটি আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত সত্যকে অস্বীকার করার শামিল হবে। (কিশ্তীয়ে নূহ-এর সারাংশ)

অতএব, হাদিস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত মসীহ প্রদত্ত এই নীতিগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। যেহেতু তিনি এ যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হাকাম (বিচারক) ও আদল (ন্যায়নিষ্ঠ মীমাংসাকারী) হিসেবে আগমন করেছেন, তাই তাঁর উপস্থাপিত ঐশী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করাই ইসলামের শক্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং, হাদিস যাচাই ও তার ওপর আমলের ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা আবশ্যক।

গায়ের আহ্‌মদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাবধানবাণী

"......যারা বিরোধী মৌলভীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় হিংসা-বিদ্বেষ আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত না হবে, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব।...... এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না- যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী হয়।...... অতএব জামা'তের সকল সদস্য মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হওয়ার জন্য এই শর্ত মানা আবশ্যক।"

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

জুমআর খুতবা

মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট আলামত যে, সে যা শোনে তাই মানুষের মধ্যে বলে বেড়ায়। (হাদিস)

“এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে মানুষ মিথ্যার ওপর নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত মনে করে। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, শেষ পর্যন্ত সত্যই সফল হয়; কল্যাণ ও বিজয় একমাত্র তারই।”

এই অভ্যাস সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায়। জামা'আতের মধ্যেও কিছু মানুষের মধ্যে এই দোষ খুব বেশি রয়েছে। কেউ কেউ আমাকে অন্য কারও সম্পর্কে লিখে পাঠায় যে সে এই করেছে, সে ওই করেছে। কিন্তু তদন্ত করলে দেখা যায়, কথাটি ভুল। আর যখন লেখককে জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমাকে কে বলেছে? এই কথা তো ভুল, ”তখন তারা বলে, “আমরা শুনেছিলাম।” আর শুধু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করেই তারা দুনিয়ায় হইচই শুরু করে দেয়। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যে, মহানবী (সা.) এমন লোকদের মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিছু লোক কেবল কথার স্বাদ নেওয়ার জন্য বা মজা পাওয়ার জন্য কিছু কথা বলে, আবার কখনও কাউকে সমাজে বদনাম করার উদ্দেশ্যেও কথা বলা হয়। যেকোনো অবস্থায়ই তারা কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কথা বলে। সুতরাং এমন লোকদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে, এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এর পাকড়াও করেন, এর শাস্তি দেন। অতএব এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয় এবং খুব বেশি ইস্তিগফারের প্রয়োজন।

অনেক ব্যবসায়িক বিরোধ মিথ্যা কথার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের কথা ও ব্যবসায় বরকত দান করেন না। দুনিয়ায় তো তারা যে ক্ষতি ভোগ করার তা করে–ই, আল্লাহর কাছেও তারা গুনাহগার সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি পায়।

যখন কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়, সেই দুর্গন্ধের কারণে যা সে সৃষ্টি করেছে। (হাদীস)

আজ আমরা যারা মহানবী (সা.)কে মেনে তাঁর প্রতি প্রকৃত ঈমান আনার ঘোষণা করি, আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজে সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ মান থাকা উচিত। অন্যথায় মহানবী (সা.)বলেছেন, যদি এটি না থাকে তবে তোমরা আমার অন্তর্ভুক্ত নও; তখন আমার সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অগণিত উপদেশ ও নির্দেশনায় তিনি সত্যবাদিতাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে পূর্ণরূপে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানবী (সা.) সর্বদা সত্য কথা বলতেন এবং আমানত ও সততায় সবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। এ কারণেই মানুষের মধ্যে তিনি সাদিক(সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

“আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে কেবল একটি উদাহরণই মহম্মদ (সা.)–এর পাওয়া যায়, যাঁকে আরববাসী আমীন ও সিদ্দীক উপাধি দিয়েছিল। অতএব আরবের দীর্ঘ ইতিহাসে গোটা জাতির একজন ব্যক্তিকে আমীন ও সিদ্দীক উপাধি দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে তাঁর আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতা এত উচ্চস্তরের ছিল যে, আরবদের জ্ঞানে অন্য কারও মধ্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। আরবরা তাদের সূক্ষ্ম বিচারবোধের কারণে বিশ্বে অনন্য ছিল। সুতরাং যাকে তারা বিরল বলে স্বীকার করেছে, তাকে অবশ্যই বিশ্বেও বিরল বলেই গণ্য করা উচিত।”

“আমার আত্মা নিজেই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং আমার জীবন নিজেই আমার সাক্ষী। তোমাদের প্রত্যেকে যদি নিজের অন্তরে তাকাও, তবে তার হৃদয় ও মস্তিষ্কও সাক্ষ্য দেবে যে সত্য তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য তার ওপর গর্ব করে এবং সেও সত্যের ওপর গর্ব করে। নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তার দৃষ্টান্ত যেন সূর্য উদিত হওয়ার মতো, যা নিজেই নিজের প্রমাণ।”

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ২৪ এপ্রিল , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৪ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)–এর সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ মানদণ্ডের আলোকে তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ এবং মু'মিনদের প্রতি উপদেশ ও নির্দেশনার কথা গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছিল, এ বিষয়ে আজও কিছু বলব।

মহানবী (সা.) আমাদেরকে সত্যবাদিতার কোন মহান মানে পৌঁছাতে চান, সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাফস বিন আসেম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এই চিহ্নই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে তা–ই মানুষের মাঝে বলে বেড়ায়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস–০৫)

এই অভ্যাসটি সাধারণত মানুষের মাঝে দেখা যায়। জামা'তেও এই মন্দ অভ্যাসটি কিছু মানুষের মধ্যে অনেক বেশি রয়েছে। আমাকেও কেউ কেউ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে লিখে দেয় যে, সে এই এই কাজ করেছে; কিন্তু তদন্তে বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরপর যখন পত্রলেখককে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাকে একথা কে বলেছে? এটি তো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! তখন তারা বলে দেয়, 'আমরা শুনেছিলাম'। আর এই শোনার ওপর ভিত্তি করেই তারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দেয়। এমন লোকদের ভেবে দেখা উচিত, মহানবী (সা.) এমন লোকদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)–এর সাহাবীদের নিকট মিথ্যার চেয়ে অন্য কোনো স্বভাব বেশি অপছন্দনীয় ছিল না। কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)–এর সামনে মিথ্যা বললে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি (সা.) যদি জানতে পারতেন যে, সে মিথ্যা বলেছে, তাহলে তাঁর (সা.) খুব কষ্ট হতো এবং তিনি মনেও রাখতেন; যতক্ষণ না তিনি আশ্বস্ত হতেন যে, সে ব্যক্তি তা থেে ক তওবা করেছে, নিজের সংশোধন করেছে এবং মিথ্যা বলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা আরম্ভ করেছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৮০, হাদীস–২৫৬৯৮)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন নারী মহানবী (সা.)–এর কাছে এসে নিবেদন করেন, আমার একজন সতীন রয়েছে; অর্থাৎ আমার স্বামীর আরেকজন স্ত্রী রয়েছে। আমার কি পাপ হবে যদি আমি আমার স্বামীর সম্পদ দ্বারা খুব বেশি পরিতৃপ্ত হওয়ার ভান করি? অর্থাৎ আমি তার সামনে এটি প্রকাশ করি যে, স্বামী আমাকে অনেক কিছু দেয়, এই দেয়, সেই দেয়– যা সে আসলে আমাকে দেয় নি। আমি কেবল তাকে ক্ষেপাতে চাই, তাকে কষ্ট দিতে চাই। আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তাকে যা দেওয়া হয় নি তা দিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার ভান

করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে মিথ্যার দুটো পোশাক পরিধান করে অর্থাৎ, যেহেতু মানসিক কষ্ট দেওয়ার জন্য এবং রাগান্বিত করার জন্য সে এই কথা বলেছিল। যাহোক, তিনি (সা.) বলেছেন, এটি সম্পূর্ণ ভুল কাজ।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াজ জিনাতাহু, হাদীস-৩৯৫৯)

এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, পোশাক শব্দটি এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণকারী। সে মিথ্যার দুটি পোশাক পরে আছে; একটি সে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে এবং অন্যটি লুঙ্গি হিসেবে পরেছে, অর্থাৎ নীচে বেঁধে রেখেছে। অর্থাৎ, সে আপাদমস্তক একজন মিথ্যাবাদী।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮৯-২৯০)(ফতহুল বারি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২২৮-২২৯)

সুতরাং, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদের মিথ্যা এড়িয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; মহানবী (সা.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হয়ে থাকে। আর যার মধ্যে এই স্বভাবগুলোর মধ্য থেকে একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে কপটতারও একটি স্বভাব থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। (এগুলো হলো,) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যদি সে অঙ্গীকার করে তবে তা ভঙ্গ করে এবং বিবাদে লিপ্ত হলে সে গালাগালি করে।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০-৮১)

এই বিষয়গুলো এমন, যা কোনো না কোনোভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায় অথবা এগুলোর মাধ্যমে মিথ্যার প্রকাশ ঘটে। সুতরাং এই নৈতিক দুর্বলতাগুলো হলো কপটতার লক্ষণ। এটি সামনে রেখে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের মাঝে এসব দুর্বলতা কতটা রয়েছে। কারণ এই বিষয়গুলো কপটতার দিকে নিয়ে যায়, আর মানুষ কখনোই মুনাফিক আখ্যায়িত হওয়া পছন্দ করে না।

অতঃপর, ভিত্তিহীন কথাবার্তা বা গুজব যারা ছড়ায় তাদের ব্যাপারে তিনি (সা.) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের (রা.) এটিও জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে? মহানবী (সা.) যখন লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন আল্লাহ্ যাদের ব্যাপারে চাইতেন- তারা বর্ণনা করুক, তারা তাঁর (সা.) কাছে বর্ণনা করতেন; অর্থাৎ যারা কোনো স্বপ্ন দেখতেন তারা তা বর্ণনা করতেন। একদিন সকালে নিজের সম্পর্কেই তিনি (সা.) বলেন, গত রাতে আমি এই দৃশ্য দেখেছি। দুইজন আগন্তুক আমার কাছে আসে। তারা আমাকে জাগায় এবং আমাকে বলে, চলুন। আমি তাদের সাথে যাই আর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছি যে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আর অপর এক ব্যক্তি তার কাছেই লোহার একটি আঁকড়া বা কাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, অর্থাৎ প্লায়ার্সের মতো বাঁকা একটি আংটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর সে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মুখের একপাশে গিয়ে মাথার পেছন পর্যন্ত চিরে ফেলে, আবার তার নাক ও চোখ থেকে আরম্ভ করে মাথার পেছন পর্যন্ত চিরে অর্থাৎ একদিকের পুরো মুখমণ্ডলটি চিরে ফেলছিল। এরপর সে সেখান থেকে সরে তার অন্য গালের দিকে যায়। অর্থাৎ প্রথমে ডান দিকে এটি করে, তারপর বাম দিকেও হুবহু তা-ই করে। দ্বিতীয় দিকে এই কাজ শেষ করার পূর্বেই প্রথম দিকটি আগের মতোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত, যা সে আগে চিরেছিল। তারপর সে আবার তার কাছে আসত এবং একই কাজ পুনরায় করত, অর্থাৎ আবার একইভাবে চিরে ফেলত। কারণ সেটি আগের মতো ঠিক হয়ে যেত। মহানবী (সা.) বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তখন তারা দুইজন আমাকে বলল, শুনুন, আমরা আপনাকে এর প্রকৃত অর্থ বলছি। আপনি যে ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলেন, যার মুখ পশ্চাৎগ্রীবা পর্যন্ত, নাকের এক পাশ থেকে ঘাড়ের পেছন পর্যন্ত এবং চোখ ও ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল- সে হলো সেই ব্যক্তি, যে সকালে নিজের ঘর থেকে বের হয় এবং একটি মিথ্যা কথা রচনা করে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাবির, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৪৬-২৫২)

অর্থাৎ গুজব রটনাকারী ব্যক্তিরা এবং মানুষের নামে মিথ্যা কথাবার্তা রচনাকারীরা।

কতক লোক এমন কিছু কথা কেবল উপভোগ করা বা মজা নেবার জন্য বলে থাকে, আবার কখনো কখনো সমাজে কারো দুর্নাম করার জন্যও এসব কথা বলা হয়। যে-কোনো অর্থে হোক না কেন, তারা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কথা বলে থাকে। সুতরাং, এমন লোকেদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। তাই এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয় এবং এর জন্য অনেক বেশি ইস্তেগফার করা প্রয়োজন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হারিস (রা.) কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনি এই রেওয়ায়েতটি হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) -র বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি রহিত করে দেবার অধিকার রাখে; অর্থাৎ, যা -ই কেনাবেচা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এক জায়গায় আছে- সেটি বাতিল করার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু যখন পৃথক হয়ে যায় তখন আর সেই অধিকার থাকে না। অথবা তিনি (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক না হয়। যদি তারা উভয়ে সততার ভিত্তিতে কাজ করে এবং পরিষ্কার কথা বলে, তাহলে ব্যাবসায় উভয়ের জন্য বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা উভয়ে প্রকৃত অবস্থা গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হারিয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত বুইয়ু, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৮-৩৯)

ব্যাবসা-বাণিজ্যের অনেক বিবাদ মিথ্যাভিত্তিক কার্যকলাপের কারণে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের কথাবার্তা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে কল্যাণ দান করেন না। পার্থিব জীবনে তাদের যে ক্ষতির সম্মুখীন হবার তা তো হয়ই, অধিকন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপেও পাপী সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি ভোগ করে।

অতঃপর হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন সে যে অপরাধটি করেছে তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৭২)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) শস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) স্তূপের ভেতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলে নিজের আঙুলে আর্দ্রতা অনুভব করেন; ভেজা ভেজা অনুভূত করেন। তিনি (সা.) বলেন, হে শস্যের মালিক! এই যে শস্য তুমি বিক্রি করছ, তা গম, ভুট্টা বা অন্য যে শস্যই ছিল, ব্যাপার কী? এটি ভেতর থেকে ভেজা কেন? সে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তুমি সেগুলো লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে শস্যের ওপরে রাখলে না কেন? যদি এর ওপরে বৃষ্টি পড়ার কারণে ভিজে গিয়ে থাকে তাহলে তা ওপরে রাখা উচিত ছিল যেন মানুষের জন্য তা দেখা সম্ভব হয়।

তিনি (সা.) আরও বলেন, যে ধোঁকা দেয় তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১৩৯)

ব্যবসায়ীদের এতটুকু সূক্ষ্মতার সাথে এ বিষয়টি দেখা উচিত। এটিই সেই মান যা তিনি (সা.) একজন মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ প্রতারণামূলক ব্যাবসা এবং মিথ্যার কারণে মুসলমানরাই পৃথিবীতে দুর্নাম হচ্ছে।

অতএব, আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেই, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সত্যের সর্বোচ্চ মান বজায় থাকা উচিত। অন্যথায় মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি এটি না থাকে, তাহলে তোমরা আমার দলভুক্ত নও; তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অসংখ্য উপদেশ ও নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি (সা.) সত্যকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা অবলম্বন করার জন্য নসীহত করেছেন। সত্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান হতেই পারে না।

তাঁর (সা.) জীবনচরিতের আলোকে এখন আমি কিছু বিষয় উপস্থাপন করছি।

তিনি (সা.) সর্বদা সত্যকথন এবং সততা ও বিশ্বস্ততায় সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকার কারণে মানুষের নিকট 'সাদিক' (তথা সত্যবাদী) এবং 'আমীন' (তথা বিশ্বস্ত) হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

যুগ খলীফার বাণী

যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

জনৈক লেখক লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.) অজ্ঞতার যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর(সা.) পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসে নি। অর্থাৎ তাঁর জাতিতে ইতঃপূর্বে কোনো নবী আসে নি। লোকেরা প্রতিমা, মূর্তি এবং শয়তানের পূজা করত। তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় শৈশবকালেই তাঁকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দান করা হয়েছিল, অথচ তিনি (সা.) শয়তানি চক্র এবং মূর্তিপূজারীদের মাঝেই বসবাস করেছেন। তিনি (সা.) কখনো কোনো প্রতিমার প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং কখনো তাদের সাথে কোনো উৎসবেও যোগদান করেন নি। তাঁর (সা.) মুখ থেকে কখনো কোনো মিথ্যা কথা শোনা যায় নি। মানুষ তাঁকে (সা.) 'সদুক' অর্থাৎ পরম সত্যবাদী, আমীন, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু মনে করত। (আমতাউল আসমা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১২)

এমনকি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের আগমনের পূর্বে অজ্ঞতার যুগেও মহানবী (সা.) -কে দিয়ে বিচার-সালিশ করানো হতো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন:

তাঁর (সা.) উত্তম চরিত্র সম্পর্কে সর্বসম্মত সাক্ষ্য সেটিই যা তাঁর জাতি প্রদান করেছিল, তাঁর নবুওয়তের দাবির পূর্বেই তাঁর জাতি তাঁর নাম রেখেছিল 'আমীন' ও 'সিদ্দীক'। পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক আছে যাদের বিরুদ্ধে অসাধুতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন মানুষও অনেক আছে যাদের কোনো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না। তবে তারা সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় এবং তাদের বিশ্বস্ততা অটুট থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জাতি তাদেরকে কোনো বিশেষ উপাধি প্রদান করে না। কেননা, বিশেষ উপাধি তখনই দেওয়া হয় যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ গুণে অন্য সব মানুষের ওপর শ্রে ষ্ঠত্ব অর্জন করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যই নিজের জীবন বাজি রাখে, কিন্তু ব্রিটিশ জাতিও প্রত্যেক সৈনিককে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' উপাধি দেয় না, আর জার্মান জাতিও প্রত্যেক সৈন্যকে 'আয়রন ক্রস' সম্মাননা প্রদান করে না। ফ্রান্সে জ্ঞানচর্চাকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকে 'লিজিয়ন অব অনার' (Legion of Honour) সম্মাননা লাভ করে না। কাজেই, কেবল কোনো ব্যক্তির বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী হওয়া তার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে 'আমীন' এবং 'সিদ্দীক' উপাধি দেওয়া একটি অসাধারণ বিষয়। মক্কাবাসীরা যদি প্রত্যেক প্রজন্মের কোনো না কোনো ব্যক্তিকে আমীন ও সিদ্দীক উপাধি দিত, তবুও সেই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনেক বড়ো মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু আরবের ইতিহাস বলে, আরবরা তাদের সকল যুগে কখনো কাউকে এই উপাধি দেয় নি। বরং আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ই (সা.) এক অনন্য উদাহরণ, যাঁকে আরববাসীরা 'আমীন' ও 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অতএব, আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে গোটা জাতির পক্ষ থেকে কেবল এক ব্যক্তিকেই 'আমীন' ও 'সিদ্দীক' উপাধি প্রদান এটিই প্রমাণ করে যে, তাঁর আমানতদারী এবং তাঁর সত্যবাদিতা উভয়টিই ছিল সর্বোচ্চ মানের, যার কোনো দৃষ্টান্ত আরবদের জানামতে কোনো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যেত না। আরবরা তাদের সূক্ষ্মদর্শিতার কারণে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব, তারা যে জিনিসকে দুর্লভ আখ্যা দিয়েছে, তা নিশ্চিতরূপেই জগতে দুর্লভ বিবেচিত হওয়ারই যোগ্য।" (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, " আজ জগতের অবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর। যে দিক থেকে এবং যেভাবেই লক্ষ করা হোক না কেন, মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করানো হচ্ছে। মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করা তো কোনো ব্যাপারই না। মিথ্যা সনদ বা সার্টিফিকেট তৈরি করে নেওয়া হয়। এমনকি ভুয়া কাগজপত্রও তৈরি করা হয়। কোনো বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা সত্যের দিকটি এড়িয়ে কথা বলে। যেখানে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা থাকে সেখানে তারা সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এখন যারা এই জামা'তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক, এটিই কি সেই ধর্ম? তিনি (আ.) বলেন, আমি জামা'ত গঠন করেছি মূলত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। তিনি (আ.) বলেন, এটিই কি সেই ধর্ম যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন? আল্লাহ্ তা'লা তো মিথ্যাকে নোংরামি আখ্যায়িত করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি মূর্তিপূজার সাথে এই মিথ্যাকে সম্পৃক্ত করেছেন; যেভাবে এক নির্বোধ মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে ত্যাগ করে পাথরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর মর্মার্থ হলো, তোমরা এজন্য অপবিত্রতা পরিহার করো কারণ এটি একটি অত্যন্ত মন্দ বিষয়। কেননা, মিথ্যা বলাও তোমাদের নোংরামিতে নিমজ্জিত হবার মতো বিষয়। তাই বলেছেন, মূর্তিপূজাও একটি অন্যায় ও নোংরা কাজ। তিনি (আ.) বলেন, এই মিথ্যাকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একজন নির্বোধ মানুষ যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে ত্যাগ করে পাথরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনি সে সত্য ও সততাকে পরিহার করে নিজের স্বার্থে মিথ্যাকে প্রতিমায় পরিণত করে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা একে মূর্তিপূজার সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন। মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকো, কেননা এটি অনেক ব ড়ো পাপ, আর মিথ্যা বলাও এর সমতুল্য। যেভাবে একজন মূর্তিপূজারী মূর্তির কাছে পরিত্রাণের জন্য হাত পাতে, তেমনিভাবে একজন মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে একটি মূর্তি বানায় এবং মনে করে, এই প্রতিমার সাহায্যে তার পরিত্রাণ লাভ হবে। তাদের কতটা অধঃপতন হয়েছে! তাদের যদি একথা বলা হয় যে, তোমরা এই প্রতিমাপূজা কেন করো? এই নোংরামি পরিত্যাগ করো। তখন তারা বলে, এটিকে আমরা কীভাবে পরিত্যাগ করব? এটি ছাড়া তো চলে না! অর্থাৎ তাদের যদি বলা হয়, প্রতিমার এই অপবিত্রতা তোমরা কেন পরিত্যাগ করো না? তখন তারা বলে, এটি ছাড়া আমাদের চলে না। নিজ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য আমাদের মিথ্যা বলতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, মিথ্যাকে নিজ জীবনের ভিত্তি জ্ঞান করে! কিন্তু আমি তোমাদেরকে আশ্বস্ত করছি, অবশেষে সত্যই সফলকাম হয় আর শুভপরিণাম ও বিজয় সত্যেরই হয়।" (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮১)

মহানবী (সা.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লেখেন: "মহানবী (সা.) যখন নিজ সহধর্মিণীকে বলেন যে, আমার ওপর এরকম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তখন স্ত্রী এ কথা বলেন নি, এসব কী আকাশকুসুম কথা বলছ? বরং তিনি বলেন, আপনি বিচলিত হবেন না, আপনি যা কিছু দেখেছেন, সঠিক দেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন না, কেননা আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, আপনি নিঃস্বদের সাহায্য করেন, আপনি হারিয়ে যাওয়া পুণ্যসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আপনি অতিথি আপ্যায়ন করেন, আপনি সত্যের সাহায্য বা সমর্থন করেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী তাঁকে (সা.) নিয়ে তার ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে যান যিনি ইহুদী শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষয়টি শোনামাত্রই বলেন, এটি তেমনই ওহী যেমনটি মূসার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এটিতে তেমনটিই আজ্ঞা ও নির্দেশমালা বিদ্যমান যেমনটি মূসার ওহীতে ছিল। এরপর তিনি লেখেন; তিনি সাক্ষ্য বর্ণনা করছেন। ইতোপূর্বেও আমি গত খুতবায় কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছিলাম। এরপর তিনি (রা.) আরো একটি সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন; একটি তো ছিল ওয়ারাকা বিন নওফেলের সাক্ষ্য। এরপর তিনি (রা.) বলেন, বাড়িতে তাঁর (সা.) সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী এক চাচাতো ভাই ছিলেন, যিনি যুবকদের মাঝে তবলীগের ভালো মাধ্যম হতে পারতেন। যখনতিনি নিজ ভাই ও ভাবীকে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদীজা (রা.)-কে গভীর নিষ্ঠার সাথে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে শোনেন, তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমিও বিশ্বাস করি আপনি সত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে এই বাক্যালাপ করেছেন এবং আপনাকে জগতের সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এরপর তিনি একজন মুক্ত ক্রীতদাসের সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন যিনি তাঁর সচ্চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে তাঁর (সা.) দুয়ারে বসে পড়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনিও যখন সেই চাপা কণ্ঠের কথোপকথন শোনেন এবং নিজ মনিবের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখতে পান তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজ মনিবের আঁচল ধরে বলেন, হে আমার মনিব! আপনি যা দেখেছেন তা-ই হবে। আপনি যা বলেছেন তা সত্য। আপনি যা দেখেছেন তা সত্য। আপনার মতো মানুষের সাথে নিয়তি কখনো প্রতারণা করতে পারে না। আপনি তো আপাদমস্তক সত্য। নিয়তি আপনার সাথে কীভাবে ধোঁকাবাজি করতে পারে? এখন সেই সময় এসে গেছে যখন আপনার হাতে জগতের সংশোধন হবে। আমাকেও আপনার সাথে থাকার এবং সেবা করার সুযোগ দিন।

আরেকটি সাক্ষ্য রয়েছে। একজন মাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, যেন একই ঝিনুকে সযত্নে লালিত আরেকটি মুক্তা। তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁর বন্ধু অস্বাভাবিক ধরনের কথা বলা শুরু করেছেন আর মানুষ বলছে, হয়ত তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে- তখন তিনি তাঁর কাছে ছুটে যান এবং দরজা খুলিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক? তিনি (সা.) যখন তার সামনে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আ ল্লাহ্ তা'লার কসম! আপনি কোন ব্যাখ্যা দেবেন না! আপনি শুধু এটি বলুন যে, এ কথা সত্য কি না? মহানবী (সা.) ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি (রা.) বলেন, হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! আমি আপনার রিসালাতে ঈমান আনছি। আপনি তো আরেকটু হলে আমার সর্বনাশ করছিলেন; দলিল উত্থাপন করে আমার ঈমানকে সংশয়পূর্ণ করে ফেলছিলেন! আমি আপনার সততা এত বেশি প্রত্যক্ষ করেছি যে, আর কোনো দলিলপ্রমাণের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তথা হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার বন্ধু! যে আপনার চেহারা একবার দেখেছে, সে কি কখনো আপনার কথায় সন্দেহ করতে পারে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিরোধিতা হওয়ার কথা ছিল; কেননা

ওয়ারাকা বিন নওফেলের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘যে ব্যক্তিই এমন বাণী নিয়ে এসেছে, সে মানুষের বিরোধিতা থেকে বাঁচতে পারে নি। কিন্তু খোদা তা’লার পরিকল্পনা দেখুন! বিরোধিতার এই ঝড় আসার পূর্বেই খোদা তা’লা কীভাবে তাঁর (সা.) জন্য সাথি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীদের মধ্য হতে ইসরাঈলী শাস্ত্রের একমাত্র আলেম ওয়ারাকা প্রথম ধাক্কাতেই তাঁর (সা.) সামনে নতজানু হয়ে গেলেন। তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণী খাদীজা (রা.) ওহী শোনামাত্রই তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসা ও সমর্থনে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাঁর যুবক ভাই আলী, যিনি সবসময় তাঁর (সা.) পারিবারিক আচার-আচরণ দেখতেন, তিনি নিজেকে তাঁর (সা.) সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ, যিনি তাঁর লেনদেন এবং দরিদ্রদের প্রতি তাঁর ব্যবহার গভীরভাবে এবং দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি তাঁর সত্যতার পক্ষে কসম খাওয়া শুরু করেন। তাঁর শৈশবের বন্ধু, মক্কার শুভাকাঙ্ক্ষী, ভদ্রতার মূর্ত প্রতীক আবু বকর শুধু তাঁর ওহী লাভের দাবির কথাটুকু শুনেই নিজ গলায় আনুগত্যের জোয়াল বেঁধে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হন। বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার এই অতুলনীয় দৃশ্য তাঁর (সা.) হৃদয়ে কত-না আনন্দের ফল্গুধারা বহমান করে থাকবে! মক্কাবাসীদের হইচই এবং তির্যক কথাবার্তা তিনি কীভাবে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকবেন আর বলবেন, এটি তোমাদের রায় যারা আমাকের চেনে না; যারা আমার সম্পর্কে বলছ যে, আমি জাদুকর, আমি অমুক, আমি তমুক ইত্যাদি। যারা আমাকে চেনে, এখন তাদের মতামতও শোনো। কীভাবে জীবন দিয়ে তারা আমার ডানে-বামে দাঁড়িয়েছে। হযরত মূসা (আ.) তার বোঝা বহনের জন্য দোয়া করে একজন সাহায্যকারী চেয়েছিলেন। এখন এখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর সাথি এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিদের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এজন্য তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করেন যে, হযরত মূসা (আ.) বোঝা বহনের জন্য একজন সাহায্যকারী চেয়েছিলেন। কিন্তু খোদা তা’লা না চাইতেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঁচজন সাহায্যকারী প্রদান করেন, আর এমন সাহায্যকারী যারা বোঝা বহনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

যদিও ওয়ারাকা বিন নওফেল স্বল্প সময়ের মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর (সা.) সত্যতার বিষয়ে অভাবনীয় সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এরপর ১২ বছর পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রা.) একজন নারী হয়ে সেই কাজ করে দেখিয়েছেন যা একজন বীরপুরুষের চোখকেও লজ্জায় অবনত করে দেয়। এরপর যায়েদ ২০ বছর পর্যন্ত আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর অবশেষে তীক্ষ্ণ তরবারির নীচে নিজের রক্ত দিয়ে প্রমাণ দেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সাহায্যকারী কীরূপ হওয়া উচিত। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন এবং খলীফা হয়ে নবরূপে নিজেদের সহযোগী হবার প্রমাণ দিয়েছেন। ”

(তফসীরে কবীর, খণ্ড-১৩, পৃ: ২০১-২০২)

এরপর মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন: একজন সত্যবাদী ও সৎ ব্যক্তির সত্যতার প্রমাণগুলো মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো তার নিজ আত্মা যা চিৎকার করে বলে, বিরোধী ও সমর্থকদের সম্বোধন করে বলে, পরিচিত ও অপরিচিতদের বলে, বিজাতীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের বলে- আমাকে দেখো এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পূর্বে চিন্তা করে দেখো, তোমরা কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারো? আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে সেই কষ্টিপাথর কি তোমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাবে না যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা কোনো বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে পারো? আমাকে প্রতারক আখ্যা দিয়ে কি তোমাদের সেই সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাবে না, যা অতিক্রম করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পৌঁছতে পারো? জগতের সবকিছুই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে এবং সবকিছু ক্রমশ হয়। পুণ্য যেমন মধ্যবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম না করে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে না, তেমনি মন্দও মধ্যবর্তী স্তরগুলো বাদ দিয়ে শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারে না। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, পশ্চিম দিকে ধাবমান ব্যক্তি হঠাৎ নিজেকে পূর্বের সুদূরপ্রান্তে দেখতে পাবে? এটা হতে পারে না যে, কেউ দৌড়াচ্ছে একদিকে আর পৌঁছে যাচ্ছে অন্যদিকে; অথবা দক্ষিণ দিকে ধাবমান ব্যক্তি নিজেকে উত্তর দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার পুরো জীবন তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি। আমি ছোটো ছিলাম এবং তোমাদের হাতে বড়ো হয়েছি। আমি যুবক ছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছি। নির্জনে ও জনসমক্ষে ঘটা আমার সবকিছু তোমাদের জানা। আমার কোনো কাজ তোমাদের কাছে গোপন নেই এবং কোনো কথা তোমাদের কাছে লুকানো নেই। তাই আমার প্রশ্ন হলো, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে বলতে পারে, আমি কখনো মিথ্যা বলেছি? মহানবী (সা.) এই ঘোষণা দিচ্ছেন, কেউ কি আছে যে বলতে পারে, আমি কখনো মিথ্যা বলেছি, অত্যাচার করেছি, ফন্দি এঁটেছি বা ধোঁকা দিয়েছি? অথবা কারো অ ধিকার খর্ব করেছি কিংবা নিজেকে বড়ো প্রমাণ করতে চেয়েছি বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছি? প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে পরীক্ষা করেছ এবং প্রতিটি অবস্থায় আমাকে পরখ করেছ, কিন্তু সর্বদা আমার পদক্ষেপ ভারসাম্যপূর্ণ পথে দেখেছ; সর্বদা ভারসাম্যের ওপর চলতে দেখেছ এবং আমাকে প্রতিটি ত্রুটি থেকে পবিত্র পেয়েছ। এমনকি বন্ধু ও শত্রু সবার কাছ থেকে আমি ‘আমীন’ (বিশ্বস্ত) ও ‘সাদিক’ (সত্যবাদী) উপাধি পেয়েছি। তাহলে ব্যাপার কী! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তো আমি বিশ্বস্ত ছিলাম, সত্যবাদী ছিলাম, ন্যায়পরায়ণ ছিলাম, মিথ্যা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলাম, সত্যের জন্য নিবেদিত ছিলাম, বরং সত্য আমা কে নিয়ে গর্ব করত; প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে এবং আমার প্রতিটি কথা তোমরা গ্রহণ করতে; কিন্তু আজ এক দিনে এমন কী পরিবর্তন হয়ে গেল যে, আমি নিকৃষ্টতম ও অপবিত্রতম হয়ে গেলাম! শুধু একটি দাবির কারণে? যে আমি কোনোদিন কোনো মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে মিথ্যা বলি নি, এখন কি আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলতে শুরু করেছি? এত বড়ো পরিবর্তন ও এমন রূপান্তরের কোনো উদাহরণ কি প্রকৃতির বিধানে কোথাও পাওয়া যায়? যদি এক -দুদিনের ব্যাপার হতো তবে তোমরা বলতে পারতে যে, লোক-দেখানোর জন্য এমনটা করছে! যদি এক-দুছরের বিষয় হতো তবে তোমরা বলতে পারতে যে, আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য সে এই পথ অবলম্বন করেছে! কিন্তু আমি তো আমার পুরো জীবন তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি। শৈশব তোমরা দেখেছ, যৌবন তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ, প্রৌঢ়ত্ব অর্থাৎ বার্ধক্য যখন শুরু হয় সেই সময়ও তোমাদের চোখের সামনে কেটেছে। এত বড়ো লোক-দেখানো আচরণ এবং এত কৃত্রিমতা কীভাবে সম্ভব? শৈশবকালে যখন নিজের ভালো-মন্দের খবর থাকে না, তখন আমি কীভাবে কৃত্রিমতা করলাম? যৌবন- যাকে উন্মাদনা বলা হয়- তাতে আমি প্রবঞ্চনামূলকভাবে নিজের অবস্থাকে কী করে গোপন রাখলাম? কিছুটা তো চিন্তা করো যে, এই প্রবঞ্চনা কখন হলো এবং কে করল? আর যদি চিন্তাভাবনা করে আমার জীবনকে নিষ্কলঙ্ক ও নিঃস্বার্থ পাও, বরং একে পুণ্যের মূর্ত প্রতীক ও সত্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখো, তবে সূর্যকে দেখে রাতের ঘোষণা দিও না! প্রকাশ্য দিনকে রাত বোলো না। আমি এমন যে, আমার বিষয়গুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকারের অভিযোগ কোরো না। তোমাদের কি আমার সত্তা ছাড়া আর কোনো দলিলের প্রয়োজন আছে? আমার সত্তাই হলো সবচেয়ে বড়ো দলিল। আমার আচরিত জীবন ছাড়া আর কি কোনো প্রমাণের দরকার আছে? আমার পুরো অতীত তোমাদের সামনে আছে, তারপরও তোমরা বলো যে, কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো?

আমার সত্তা নিজেই আমার সাক্ষী এবং আমার জীবনকালই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি প্রতিটি ব্যক্তি নিজের মনের গভীরে অবগাহন করে, তবে তার হৃদয় ও তার মস্তিষ্কও এ সাক্ষ্য দেবে যে, সত্য এই ব্যক্তির মাঝে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর এ ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য তাকে নিয়ে গর্বিত এবং সে সত্যের জন্য গর্বিত। এ ব্যক্তি নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়। এর উদাহরণ হলো- ‘আফতাব আমাদ দলিল আফতাব’- অর্থাৎ সূর্যের উদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এটিই সেই শক্তিশালী প্রমাণ যা আবু বকর (রা.)-র হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল এবং এটিই সেই শক্তিশালী দলিল যা সর্বদা সত্যপ্রিয় মানুষদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে থাকবে। মহানবী (সা.) যখন (নবুওয়তের) দাবি করেছিলেন তখন হযরত আবু বকর তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক মুক্তকৃত দাসী তাঁকে সংবাদ দেয়, আপনার বন্ধুর স্ত্রী বলছেন যে, তার স্বামী সেই প্রকারের নবী হয়েছেন যেমনটি নবী মূসা (আ.) ছিলেন। তিনি (রা.) তখনই উঠে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে চলে যান এবং তাঁর (সা.) কাছে জানতে চান, আপনি কি একথা বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল? মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে বলেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত আবু বকর একথা শোনামাত্রই তাঁর (সা.) দাবি মেনে নেন। মহানবী (সা.)-ও তাঁর (রা.) ঈমান সম্পর্কে বলতেন, আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছি তার পক্ষ থেকেই কিছুটা বাধা, দ্বিধা বা ইতস্ততভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আবু বকরের সামনে যখন ইসলাম উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি মোটেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, বরং সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন।

সেটি কী ছিল যা হযরত আবু বকরকে কোনো নিদর্শন দেখা ছাড়াই মহানবী (সা.)-এর ওপর ঈমান আনতে বাধ্য করেছিল? এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর সেই বিবেকসজ্জিত পবিত্র সত্তা যা নিজেই নিজের সত্যতার সাক্ষী।”

একইভাবে হযরত খাদীজা, হযরত আলী, হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাক্ষ্য বর্ণনা করেছি, যারা তাঁর (সা.) সত্যতা দেখে সবাই এর সাক্ষী হয়েছিলেন।

“মোদ্দাকথা, নবীর সত্যতার প্রথম অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হলো তাঁর নিজের সত্তা- যা বাস্তব অবস্থার নিরিখে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আর এ সাক্ষ্য এতই জোরালো হয় যে, এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো মুজিযা বা নিদর্শনের প্রয়োজনই পড়ে না। ”

(দাওয়াতুল আমীর, আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২৫-৪২৮)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার বাণী থেকে বুঝা যায়, মুত্তাকী (তথা খোদাভীরু) তারা হয়- যারা নম্রতা ও বিনয়ের সাথে বিচরণ করে। তারা অহংকারমূলক কথাবার্তা বলে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেমনটা ছোটোরা বড়োদের সাথে কথা বলে। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেটিই করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠিকা নেন নি। তিনি কেবল খাঁটি তাকওয়া (তথা খোদাভীতি) চান। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাবে। মহানবী (সা.) কিংবা হযরত ইবরাহীম (আ.) কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে তো সম্মান পান নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস হলো, মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না; লোকেরা এ প্রশ্নও তোলে; সেটির উত্তরও তিনি (আ.) এখানে দিয়েছেন যে, আমাদের বিশ্বাস হলো, তাঁর (সা.) সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না; কিন্তু এটি তো নবুওয়ত পাইয়ে দেয় নি। এটি তো ছিল তাঁর সেই নিষ্ঠার কারণে প্রাপ্ত ঐশী অনুগ্রহ, যা তাঁর প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল; এটিই ছিল ঐশী অনুগ্রহ আকর্ষণের মূল কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.)- যিনি 'আবুল আম্বিয়া' (তথা নবীদের পিতা) ছিলেন, তিনি নিজের নিষ্ঠা ও তাকওয়ার কল্যাণে নিজের পুত্রকে কুরবানী করতে কোনো দ্বিধা করেন নি। তিনি স্বয়ং আগুনে নিক্ষিপ্ত হলেন এই এক কথার ওপর।

তিনি বলেন, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখুন! তিনি (সা.) সব ধরনের কুপ্রথার মোকাবিলা করেছেন, নানা প্রকারের বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু এর কোনো পরোয়া করেন নি। এটিই ছিল সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা- যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন। এ জন্যই তো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(আল-আহযাব: ৫৭) 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো'। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম এমন ছিল, আল্লাহ্ তা'লা যেগুলোর প্রশংসা করার বা গুণের সীমা নির্ধারণ করার জন্য কোনো বিশেষ শব্দ নির্ধারণ করেন নি; কোনো বিশেষ শব্দে তা সীমাবদ্ধ করেন নি। শব্দ তো পাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.) পুণ্যকর্মের প্রশংসা সীমাবদ্ধ করা যায় না। পুণ্যকর্মগুলো এমন ছিল যেগুলোকে আমরা সীমাবদ্ধ করতে পারি না। এ ধরনের আয়াত অন্য কোনো নবীর জন্য ব্যবহৃত হয় নি। তাঁর আত্মার মাঝে সেই সততা ও পবিত্রতা ছিল এবং তাঁর কর্ম আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই নির্দেশ দিয়েছেন- আগামীতে লোকেরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দরুদ পাঠ করবে। তাঁর (সা.) দৃঢ়চিত্ততা ও নিষ্ঠা এমন ছিল যে, আমরা যদি ওপরে বা নীচে দৃষ্টি দেই তবে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। স্বয়ং মসীহ্‌র [তথা ঈসা (আ.)-এর] যুগটি দেখে নেওয়া যাক, তাঁর দৃঢ়তা বা আধ্যাত্মিক সততা ও পবিত্রতার প্রভাব তাঁর অনুসারীদের ওপর কতটুকু পড়েছিল! প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, একজন দুশ্চরিত্র মানুষকে সংশোধন করা কতটা কঠিন; বদ্ধমূল অভ্যাসগুলো দূর করা কতটা অসম্ভব কাজ! অভ্যাসগুলো পাকাপোক্ত হয়ে গেলে সেগুলোকে ঠিক করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সা.) তো হাজার হাজার মানুষকে সংশোধন করেছেন যারা পশুর চেয়েও অধম ছিল। কিছু মানুষ তো পশুর মতো মা - বোনদের মাঝে পার্থক্য করত না। এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করত, মৃতদের ধনসম্পদ গ্রাস করত, কেউ কেউ নক্ষত্রপূজারি ছিল, কেউ নাস্তিক ছিল আবার কেউ ছিল প্রকৃতিপূজারি। আরব উপদ্বীপ কী ছিল? তা বহু ধর্মের এক সংমিশ্রণ নিজের ভেতর ধারণ করত। এর ফলে যে মহান কল্যাণ সামনে আসে তা হলো, কুরআন করীম সব ধরনের শিক্ষা নিজের ভেতর ধারণ করে। আর প্রতিটি ভ্রান্ত বিশ্বাস বা মন্দ শিক্ষা যা পৃথিবীতে থাকা সম্ভব, তার মূলোৎপাটনের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা এতে বিদ্যমান। এটি আল্লাহ্ তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১-৩৩)

তিনি মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন অজ্ঞতা চরমে পৌঁছেছিল আর তারপর তিনি (সা.) এই পশুদের মানুষ বানিয়েছেন।

اللّٰهم صل علی محمد وعلی اٰل محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর (সা.) সেই উত্তম আদর্শের ওপর চলার এবং কুরআন করীম ও তাঁর (সা.) নির্দেশাবলি অনুযায়ী আমল করে সত্যের মানদণ্ডকে সুউচ্চ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ মে, ২০২৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

বদর পত্রিকা নিজেও পড়ুন এবং আপনার বন্ধু-বান্ধবকেও এটি পড়তে উৎসাহিত করুন

সাইয়্যিদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ, বদর পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১৪)-এর জন্য তাঁর বার্তা প্রেরণ করতে গিয়ে বলেছেন:

"বদর-এর সম্পাদকমণ্ডলী ও পাঠকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সংবাদপত্র জামা'আতের সদস্যদের আত্মিক সংস্কার ও উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছিল। আমাদের বুজুর্গরা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সর্বান্তকরণে এটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের দোয়া ও পবিত্র প্রচেষ্টার বরকতেই এটি আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। এই বিষয়টি দাবি করে যে যত বেশি সম্ভব আহমদী এটি পড়বেন এবং এর থেকে উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে বিশেষভাবে ওহফরধ-এর আহমদীদের এবং সাধারণভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী আহমদীদের এটি অধ্যয়ন করার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরকতসমূহ অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন।"

সাইয়্যিদনা হযরত আকদাস আমীরুল মুমিনীন খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ-এর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদর্শী নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জামা'আতে আহমদিয়ার সদস্যদের নিকট বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে যে, প্রতিটি ঘরে বদর পত্রিকার নিয়মিত পাঠ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বদর পত্রিকায় কুরআন ও হাদিস, এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উচ্চাঙ্গ বাণী ছাড়াও হুজুর আনোয়ারের জুমার খুতবা, ভাষণ, এবং হুজুর আনোয়ারের বিভিন্ন দেশের বরকতময় সফরের অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ঈমানবর্ধক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হয়, যার অধ্যয়ন প্রত্যেক আহমদীর জন্য প্রয়োজনীয়।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এবং সাইয়্যিদনা হুজুর আনোয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ-এর স্নেহে এখন এই পত্রিকা উর্দুর পাশাপাশি হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, ওড়িয়া এবং কন্নড় ভাষায়ও প্রকাশিত হচ্ছে।

যেসব আহমদী বন্ধু এখনও পর্যন্ত বদর পত্রিকা নিজেদের নামে চালু করেননি, তাঁদের নিকট অনুরোধ-নিজেদের নামে **আখবার বদর** চালু করুন, নিজেও পড়ুন এবং আপনার সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও এটি পড়ার সুযোগ করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাইয়্যিদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন-এর নির্দেশাবলীর ওপর হুবহু, তার প্রকৃত মর্ম অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বদর পত্রিকা সময়মতো না পৌঁছানো, চাঁদা পরিশোধ, অথবা যেকোনো ধরনের তথ্যের জন্য সাপ্তাহিক বদর পত্রিকার অফিস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জাযাকুমুল্লাহ।

(সম্পাদকমণ্ডলী)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৪৮} পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত বর্ণনাকারী নিবেদন করছে যে আমাদের দাদার দাদা, অর্থাৎ মির্জা গুল মুহাম্মদ সাহেব, অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়ে কাদিয়ান ছিল কর্মনিষ্ঠ আলেমদের একটি কেন্দ্র। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই শিখদের দ্বারা আমাদের পৈতৃক জায়গিরের ওপর আক্রমণ শুরু হয় এবং কয়েকটি গ্রাম দখল হয়ে যায়। তবুও তিনি জায়গিরের একটি বড় অংশ রক্ষা করতে সক্ষম হন।

তাঁর মৃত্যুর পর, যা সম্ভবত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ঘটে, তাঁর পুত্র মির্জা আতা মুহাম্মদ সাহেব পরিবারের প্রধান হন। তাঁর সময়ে রামগড়িয়া শিখরা সমগ্র জায়গির দখল করে নেয় এবং তিনি বাধ্য হয়ে কাদিয়ান-এ আশ্রয় নেন, যা সে সময় তার দুর্গপ্রাচীরের কারণে সুরক্ষিত ছিল। শেষ পর্যন্ত শিখরা প্রতারণার মাধ্যমে শহরটি দখল করে, আমাদের গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেয়, এবং মির্জা আতা মুহাম্মদ সাহেবকে পরিবার-পরিজনসহ কাদিয়ান ত্যাগ করতে হয়।

অতঃপর মির্জা আতা মুহাম্মদ সাহেব বেগোয়াল-এর জায়গিরে, কাপুরথলা অঞ্চলে চলে যান, যেখানে শিখ প্রধান তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং অতিথি হিসেবে রাখেন। কয়েক বছর পরে শত্রুরা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে এবং তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় আমাদের দাদা এখনও খুব অল্পবয়সী ছিলেন। তবে তাঁর মা বলতেন, অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতার মৃতদেহ কাদিয়ানে ফিরিয়ে আনেন, যাতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা যায়। সেখানে শিখরা বাধা দেয়, কিন্তু কাদিয়ানের সাধারণ জনগণ, বিশেষত নিম্নশ্রেণির লোকেরা, আমাদের দাদাকে সমর্থন করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে শিখরা বিদ্রোহের আশঙ্কা করতে থাকে, ফলে তারা দাফনের অনুমতি দেয়। এরপর আমাদের দাদা ফিরে যান।

এই সময়ে শিখরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছিল, এমনকি কিছু মসজিদকে ধর্মশালায় (শিখ উপাসনালয়) রূপান্তরিত করেছিল। পরে মহারাজা রঞ্জিত সিংহ-এর শাসনামলে রামগড়িয়াদের শক্তি ভেঙে যায় এবং সমগ্র অঞ্চল মহারাজা রঞ্জিত সিংহের অধীনে আসে। তখন আমাদের দাদা মহারাজার কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক জায়গিরের একটি অংশ পুনরুদ্ধার করেন এবং কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

এরপর আমাদের দাদা এবং তাঁর ছোট ভাই মির্জা গোলাম মুহিউদ্দিন সাহেবমহারাজা রঞ্জিত সিংহ-এর অধীনে বহু সামরিক সেবা প্রদান করেন। এই সমস্ত বিবরণ পাঞ্জাব চিফস গ্রন্থে, যা স্যার লেপেল গ্রিফিন রচনা করেছেন, লিপিবন্ধ রয়েছে।

শিখ শাসনের অবসানের পর দেশে পুনরায় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের পরিবার আরও দুর্দশার সম্মুখীন হয়। আমাদের দাদা এবং তাঁর ভাই মির্জা গোলাম মুহিউদ্দিন সাহেবের কিলা বাসরাওয়ান-এ বন্দিত্বের ঘটনাটি সম্ভবত এই সময়কার।

ব্রিটিশরা আসার পর তারা আমাদের পারিবারিক জায়গির বাজেয়াপ্ত করে এবং কেবল বছরে সাতশত টাকা নগদ সম্মানসূচক পেনশন মঞ্জুর করে। আমাদের দাদার মৃত্যুর পর তা কমিয়ে একশত আশি টাকা করা হয় এবং আমাদের চাচা (তায়া সাহেব)-এর মৃত্যুর পর তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তদুপরি, এই বিরাট অস্থিরতা-শিখ শাসনের শেষ পর্যায়ের অরাজকতা এবং পরবর্তী সাম্রাজ্য পরিবর্তনের ফলে-কাদিয়ান ও তার আশপাশের অঞ্চলে আমাদের মালিকানাস্বত্ব নিয়ে বহু বিরোধ ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এর ফলে কিছু গ্রামের ওপর আমাদের অধিকার সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। কাদিয়ান এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি গ্রামের জন্য আমাদের দাদা বিপুল অর্থ ব্যয় করেন এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু অধিকার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

বলা হয়, মামলা দায়েরের আগে আমাদের দাদা তাঁর সকল আত্মীয়কে বলেছিলেন: "আমি মামলা দায়ের করতে চাই। তোমরা যদি আমার সঙ্গে যোগ দিতে চাও, তবে দিতে পার।" কিন্তু সফলতার সম্ভাবনা কম থাকায় সবাই অস্বীকার করে এবং বলে, "আপনি নিজেই মামলা করুন; যদি কিছু উদ্ধার হয়, তা আপনি রাখবেন।" কিন্তু পরে যখন কিছু অধিকার পুনরুদ্ধার হলো, তখন আমাদের দাদার উকিলের সরলতার কারণে মালিকানার নথিতে সকল আত্মীয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তথাপি প্রকৃত দখল কেবল আমাদের দাদার কাছেই ছিল, অন্যরা শুধু আয়ের একটি অংশ পেত।

{৪৯} পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

চৌকো বাক্স দিয়ে বেষ্টিত নামগুলো হলো সেই ব্যক্তিদের নাম, যারা ১৮৬৫ সালে কাদিয়ানে যৌথ-অংশীদার হিসেবে নথিভুক্ত ছিলেন। কাদিয়ানের সমগ্র সম্পত্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে দুই ভাগ মির্জা তাসাদ্দুক জিলানী-এর বংশধরদের, দুই ভাগ মির্জা গুল মুহাম্মদ সাহেব-এর বংশধরদের, এবং এক ভাগ বিশেষভাবে মির্জা গোলাম মুর্তজা সাহেব-কে মনসব (সরকারি পদ বা অধিকার) হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে কেবল তাঁর বংশধরদের মধ্যেই বিভক্ত হয়।

বিনীত বর্ণনাকারী নিবেদন করছে যে আমাদের দাদার মৃত্যুর পর, যেসব সহ-অংশীদার প্রকৃত দখলে ছিলেন না, তারা মির্জা ইমামউদ্দিন প্রমুখের দুষ্ট প্ররোচনায় আমাদের চাচা (তায়া) মির্জা গোলাম কাদির সাহেব-এর বিরুদ্ধে সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগে মামলা দায়ের করে। শেষ পর্যন্ত চিফ কোর্ট তায়া সাহেবের বিরুদ্ধে রায় দেয়।

এরপর পূর্ববর্তী মীমাংসা অনুযায়ী মির্জা তাসাদ্দুক জিলানী-এর পুত্রদের অংশ এবং মির্জা কাসিম বেগ-এর পুত্র মির্জা গোলাম গওস-এর অংশ মির্জা আজম বেগ লাহোরি ক্রয় করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মামলার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন। মির্জা গোলাম মুহিউদ্দিন সাহেব-এর পুত্ররা নিজেদের নিজ নিজ অংশের দখল নিজেরাই গ্রহণ করেন। যেহেতু মির্জা গোলাম হুসাইন কোনো সন্তান রেখে যাননি, তাই তাঁর অংশ মির্জা গোলাম মুর্তজা সাহেব-এর পুত্রদের এবং মির্জা গোলাম মুহিউদ্দিন সাহেব-এর পুত্রদের মধ্যে চলে যায়।

বিনীত বর্ণনাকারী নিবেদন করছে যে বর্তমানে মির্জা তাসাদ্দুক জিলানী এবং মির্জা কাসিম বেগ-এর সমগ্র শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে মির্জা গোলাম হায়দার-এর শাখাও বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের চাচা মির্জা গোলাম কাদির সাহেব, মির্জা ইমামউদ্দিন, এবং মির্জা কামালউদ্দিনও নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তবে মির্জা নিজামউদ্দিন-এর একজন পুত্র, মির্জা গুল মুহাম্মদ, আছেন, যিনি আহমদী হয়েছেন এবং হযরত সাহেবের (মসীহ মওউদ)-এর রূহানি বংশধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"তোমার বংশধারা ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আমি তোমা হতেই (আরেক বংশধারা) সৃষ্টি করব।" (তাযকিরা, পৃ. ৩৯৭, ২০০৪ সংস্করণ)

এই ইলহাম সেই সময়ে প্রাপ্ত হয়েছিল, যখন পারিবারিক বংশবৃক্ষের এই সমস্ত শাখা তখনও সজীব ও বিকশিত ছিল।

{৪৯} পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমার সম্মানিতা মাতা (হযরত ওয়ালিদা সাহেবা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে একবার, তাঁর যৌবনকালে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) আপনার দাদার পেনশন গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। মির্জা ইমামউদ্দিন তাঁর পিছু নেয়। পেনশনের টাকা গ্রহণ করার পর মির্জা ইমামউদ্দিন তাঁকে প্রতারণা করে এবং তাঁকে কাদিয়ানে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরিয়ে বেড়ায়। যখন সে সমস্ত টাকা অপচয় করে ফেলে, তখন তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

হযরত মসীহ মওউদ এতটাই লজ্জিত হন যে তিনি বাড়ি ফিরে যাননি। যেহেতু আপনার দাদা সবসময় চাইতেন যে তিনি কোনো চাকরি গ্রহণ করুন, তাই তিনি সিয়ালকোট-এ ডেপুটি কমিশনারের আদালতে অল্প বেতনের একটি চাকরি গ্রহণ করেন এবং কিছু সময় সেখানে কর্মরত থাকেন। যখন আপনার দাদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আপনার দাদা বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসতে বলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হন। অমৃতসর পৌঁছে তিনি কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য একটি এক্কা (ঘোড়ার গাড়ি) ভাড়া করেন। ঠিক সেই সময় কাদিয়ান থেকে আরেকজন লোকও তাঁকে আনতে এসে পৌঁছায়।

সেই ব্যক্তি বলল, "এক্কা দ্রুত চালান, কারণ তাঁর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।"

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলল, "তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তাড়াতাড়ি করুন, হয়তো তিনি ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন।"

ওয়ালিদা সাহেবা বলতেন যে হযরত সাহেব বর্ণনা করতেন: "ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি বুঝেছিলাম যে আমার মা প্রকৃতপক্ষে ইন্তেকাল করেছেন। কারণ যদি তিনি তখনও জীবিত থাকতেন, তবে লোকটি এমন কথা বলত না।"

তাঁরা কাদিয়ানে পৌঁছালে নিশ্চিত হয় যে তিনি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।

ওয়ালিদা সাহেবা আরও বর্ণনা করেন যে হযরত সাহেব বলতেন, তাঁদের ছেড়ে যাওয়ার পর মির্জা ইমামউদ্দিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে একটি চা-বোঝাই কাফেলা লুট করে এবং ধরা পড়ে, কিন্তু মামলায় খালাস পায়। হযরত সাহেব বলতেন, "মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমাদের খাতিরে তাকে কারাবাস থেকে রক্ষা করেছেন; নচেৎ সে যেমনই হোক না কেন, আমাদের বিরোধীরা অবশ্যই বলত যে তার এক চাচাতো ভাই জেলে গিয়েছিল।"

বিনীত বর্ণনাকারী নিবেদন করছে যে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়ালকোটে চাকরিকাল ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত ছিল।

টীকা:এই বর্ণনা থেকে যেন কেউ এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে যে হযরত মসীহ মওউদ(আলাইহিস সালাম) মির্জা ইমামউদ্দিন-এর প্রতারণায় দাদার পেনশনের অর্থ হারানোর কারণে সিয়ালকোটে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ হযরত মসীহ মওউদ নিজেই তাঁর লেখনিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে চাকরি গ্রহণের একমাত্র কারণ ছিল তাঁর পিতার অবিরাম জোরাজুরি। অন্যথায় তিনি নিজে চাকরির ধারণার বিরোধী ছিলেন। অনুরূপভাবে চাকরি ছাড়ার প্রকৃত কারণও ছিল চাকরির প্রতি তাঁর অনাগ্রহ; তিনি বারবার পিতাকে চাকরি ত্যাগের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখতেন। কিন্তু তাঁর পিতা অনুমতি দেননি। অবশেষে যখন তাঁর মাতা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁর পিতা সংবাদ পাঠিয়ে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসার অনুমতি দেন।

অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

ওয়াকিফাত-ই-নও বালিকাদের ক্লাস

এরপর হুজুর আনওয়ার(আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করুন) এর সাথে ওয়াকিফাত-ই-নও বালিকাদের ক্লাস শুরু হয়।

প্রোগ্রামটি পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়, যা আজিজাহ যোহা সাঈদ করেন। এর ইংরেজি অনুবাদ আজিজাহ বাসমা কাদির এবং উর্দু অনুবাদ আজিজাহ নিদা সালমান উপস্থাপন করেন।

এরপর আজিজাহ সাউবানা কানওয়াল পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত হাদিস তিলাওয়াত করেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলো বলে দেব না?"আমরা বললাম: "জি হুজুর, অবশ্যই বলুন।" তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন একটি বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন; তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং জোরের সাথে বললেন: "শোনো! তৃতীয় বড় গুনাহ হলো মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি এতবার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমরা চাইছিলাম যেন হুজুর চুপ করে যান।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু হুকুকিল ওয়ালিদাইন)

এই হাদিসের ইংরেজি অনুবাদ আজিজাহ আলিনা আহমদ উপস্থাপন করেন।

এরপর আজিজাহ ফাইজা কালীম **হযরত আকদাস মসীহ মাউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিম্নোক্ত কবিতা সুন্দর সুরে আবৃত্তি করেন:

ওহ পেশওয়া হামারা জিস সে হ্যায় নুর সারা
নাম উসকা হ্যায় মুহাম্মদ দিলবার মেরা এহি হ্যায়

হুজুর আনওয়ার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রোগ্রামে হযরত আকদাস মসীহ মাউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর কোনো মালফুজাত (বাণী) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মালফুজাত প্রস্তুত করা হয়নি। ছেলেদের জন্য যতটা সময় দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের জন্যও ঠিক ততটাই ছিল। ছেলেরা করেছে, তোমরাও করতে পারতে।

একজন ওয়াকিফাহ-ই-নও ছাত্রী আরজ করেন: "আমি কমার্স পড়ছি এবং আমার প্রোগ্রাম হলো হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট। এরপর আমার কী করা উচিত?"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "তোমাকে ওয়াকফ (জীবন উৎসর্গ) করতে হবে। তুমি কি অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে যাবে?"

মেয়েটি উত্তর দেন: "হুজুর যেখানে বলবেন, আমরা সেখানেই চলে যাব।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "কবিতার মতো করে যাবে, নাকি সত্যি সত্যি যাবে? কবিতায় তো তোমরা অনেক পড়ো যে 'আমরা এটা করব, ওটা করব'।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "ঠিক আছে, লিখে পাঠাও, তারপর আমি বলে দেব কী করতে হবে।" একজন মেয়ে প্রশ্ন করেন: "হুজুর! যদি আপনার নিজের কোনো মেয়ে থাকত এবং সে ওয়াকিফাহ-ই-নও হতো, তাহলে আপনি তার জন্য কোন বিষয় পছন্দ করতেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর আনওয়ার বলেন: "আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমার একটি মেয়ে আছে, কিন্তু সেই সময় ওয়াকিফাত-ই-নও তাহরীক ছিল না, তাই সে ওয়াকিফাহ-ই-নও নয়। আর তার জন্য আমি কী পছন্দ করতাম? আমি তার সঠিক লালন-পালন করতাম যাতে সে নিজেই বুঝতে পারে যে ওয়াকিফাত-ই-নও কী জিনিস, এবং নিজের জন্য সেই পথ বেছে নিত যাতে সে জামাতের সেবা সবচেয়ে উত্তম পন্থায় করতে পারে।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "এছাড়া আমি মেয়েদের জন্য ইতিমধ্যে ছয়-সাতটি বিষয় উল্লেখ করেছি; তোমরা এর মধ্য থেকে বেছে নিতে পারো। শিক্ষকতা ভালো, চিকিৎসাবিজ্ঞান ভালো। পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, দুটি জ্ঞান সবচেয়ে উত্তম: ইলমুল আদইয়ান (ধর্মের জ্ঞান) এবং ইলমুল আজসাম (শরীরবিজ্ঞান অর্থাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞান)। তাই তোমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানেও যেতে পারো। নারীরা ভালো ভাষাবিদও হতে পারে - ভাষা শেখো এবং সাহিত্যের অনুবাদ করো। কিছু মেয়ে গবেষণাতেও যায়, এমনকি প্রত্নতত্ত্বেও গিয়েছে। অথবা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে অন্যদেরকেও শেখাও।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ ও ঝোঁক থাকে যে কোন বিষয়ে যেতে চায়। আমরা ওয়াকিফাত-ই-নওদেরকে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিয়ে থাকি, কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। আমরা কখনো কাউকে জোর করে কিছু করাইনি। এজন্যই ছয়-সাতটি বিষয় সাজেস্ট করা হয়েছে - যেটা তোমাদের পছন্দ হয় সেটা বেছে নাও এবং যে ক্ষেত্রে যেতে চাও সেখানে চলে যাও।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "আমার ক্লাসের রিপোর্টগুলো পড়ো এবং শোনো। বিভিন্ন দেশের সাথে আমার ক্লাসের রিপোর্টগুলো পড়ে নাও অথবা এমটিএ-তে শুনে নাও। সবাই এমটিএ-এর সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করো। কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও আলাদা আলাদা ক্লাস হয়। সেগুলোও দেখো এবং অবশ্যই শোনো। আমার খুতবাগুলোও সবাই অবশ্যই শোনো। এ বছরের শুরুতে, সম্ভবত এপ্রিল মাসে, আমি ওয়াকিফাত-ই-নও সম্পর্কে একটি খুতবা দিয়েছিলাম। সেটি দেখো এবং পড়ো। একইভাবে এ বছর এবং গত বছর ইউকে-তে ওয়াকিফাত-ই-নও ইজতেমায় আমি যে দুটি অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম, সেগুলোও পড়ো। দুটি অ্যাড্রেসই ইংরেজিতে ছিল।"

একজন ওয়াকিফাহ-ই-নও ছাত্রী আরজ করেন: "আমি পাকিস্তান থেকে বি.এ. করেছি।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "হিস্ট্রি ও ইসলামিয়াত বিষয় হবে এবং ইংরেজি বাধ্যতামূলক।"

মেয়েটি বলেন: "জি, ঠিক তাই।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "আমার জানামতে এমনই হয়। তাই বি.এ.টা সম্পন্ন করে ফেলো, যাতে কেউ না বলতে পারে যে ডিগ্রি নেওয়া হয়নি। তবে চিন্তা-ভাবনা করে বিষয় বা ক্ষেত্র বেছে নেওয়া উচিত। এখন যেহেতু তুমি এখানে এসেছ, ইংরেজিতে ভর্তি হয়ে যাও, প্রথমে ইংরেজিতে ডিপ্লোমা করো, তারপর ডিগ্রি করো এবং তারপর আমাদের অনুবাদ টিমে যোগ দাও যারা উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে। তোমার জন্য আমি এটাই পছন্দ করছি - ইংরেজি ভাষা শেখো এবং এতটাই পালিশ করো যাতে তুমি অত্যন্ত দক্ষ হয়ে যাও এবং উত্তম অনুবাদ করতে পারো।"

একজন মেয়ে আরজ করেন যে, তিনিও পাকিস্তান থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বিষয় ছিল সাইকোলজি ও সোসিওলজি। তিনি 'ইসলামাবাদ কলেজ ফর গার্লস' থেকে পড়াশোনা করেছেন। হুজুর আনওয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে মেয়েটি জানান যে, এটি ইংরেজি মাধ্যম ছিল। এতে হুজুর আনওয়ার বলেন, "শুকরিয়া, কিছুটা ভালো হয়েছে।"

মেয়েটি আরজ করেন: "এখন আমি আমার স্বামীর সাথে অস্ট্রেলিয়ায় আছি এবং আমার দুটি সন্তানও আছে।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "যদি পাশাপাশি পড়াশোনা করতে পারো তাহলে করো। প্রথমে তোমার ইংরেজি ভাষা পালিশ করো, তারপর যদি সাইকোলজি বা অ্যানথ্রোপোলজিতে ভর্তি পাও তাহলে করতে পারো।" মেয়েটি জানান যে, তিনি ইংরেজির ছয় মাসের কোর্স করেছেন এবং এখন চিলড্রেন সার্ভিসেসে ডিপ্লোমা করছেন।

হুজুর আনওয়ার বলেন: "এটাও ঠিক আছে। চিলড্রেন সার্ভিসেসেও তো সাইকোলজি পড়ানো হয়। ঠিক আছে, এটা করো এবং আমার মনে হয় পরে তুমি টিচিংয়ে চলে যাবে।"

একজন মেয়ে প্রশ্ন করেন: "হুজুর আনওয়ারের জীবনে কি এমন কোনো মুহূর্ত ছিল যখন হুজুরের মনে হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাৎক্ষণিক সাহায্য করেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর আনওয়ার বলেন: "অনেক বড় বড় উপলক্ষ এসেছে যখন আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিক সাহায্য করেছেন।

একবার আমার কিছু কাজ ছিল যা আমাকে আমার আব্বার মাধ্যমে করাতে হতো, কিন্তু আমি তাঁকে বলিনি কারণ আমার মধ্যে জিজ্ঞাসা করার দ্বিধা ছিল। মাত্র পনেরো মিনিট সময় ছিল। আমি আল্লাহ মিয়াঁকে বললাম: 'এই পনেরো মিনিট। যদি এর মধ্যে আমার কাজ হয়ে যায়, তাহলে আমার ঈমান তো আগে থেকেই আছে, আরও দৃঢ় হয়ে যাবে।' বারো মিনিট গেল, তেরো মিনিট গেল, চৌদ্দ মিনিট গেল এবং পনেরোতম মিনিটে আমার আব্বা আমাকে ডাকলেন এবং আমার মনে যে ইচ্ছা ছিল তা পূর্ণ করে দিলেন। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে।"

একজন মেয়ে প্রশ্ন করেন: "হুজুরের কি মেলবোর্ন শহর ভালো লেগেছে?"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "তোমরা যে সেন্টারটি এখানে নিয়েছো তা খুব সুন্দর জায়গায়, তবে এখনও পরিকল্পনা আরও উন্নত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আজ আমি সামান্য সময়ের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলাম। কাছেই বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখেছি। তারপর সেই পাহাড়ের উঁচু জায়গাটি, যার নাম ড্যান্ডেনং। সেখান থেকে মেলবোর্ন শহরের দৃশ্য খুব সুন্দর লেগেছে।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "প্রত্যেক জায়গাই ভালো। যদি তোমরা ভালো হও এবং ভালো হয়ে যাও, তাহলে জিনিসগুলোও ভালো হয়ে যাবে।"

একজন মেয়ে প্রশ্ন করেন: "আমরা আল্লাহ তা'আলাকে কেন দেখতে পাই না?

এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর আনওয়ার বলেন: "আল্লাহ তা'আলা তো নূরের

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ইই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

উপর নূর - তিনি কীভাবে দৃশ্যমান হতে পারেন? তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতসমূহ দৃশ্যমান হয়। যখন তোমরা দোয়া করো এবং তা কবুল হয়, তখন দোয়া কবুল হওয়ার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ ঘটে। এইমাত্র আমি তোমাদের বলেছি যে, আমি আল্লাহকে বলেছিলাম পনেরো মিনিট সময় আছে এবং আমি চাই এর মধ্যে আমার কাজ হয়ে যাক, আর আল্লাহ তা'আলা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিয়েছেন। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টি - গাছপালা, উদ্ভিদ - এবং অস্ট্রেলিয়া তো তার ফ্লোরা অ্যান্ড ফনার জন্য বিখ্যাত। এসবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। বলা হয়, যদি গাছের পাতা না থাকে তাহলে ক্লোরোফিলের মাধ্যমে তার জীবন গঠিত হয় এবং পাতাগুলো তাদের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এখানে আমি এমন গাছও দেখেছি যা শুধু একটি ডাল, আর সেই ডালই পাতার ভূমিকা পালন করছে এবং তার উপরে একটি খুব বড় ও সুন্দর রঙিন ফুল ফুটে আছে। এটিও আল্লাহ তা'আলার কুদরত। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা গভীরভাবে দেখলে সেখানেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।"

একজন ওয়াকিফাহ-ই-নও প্রশ্ন করেন: "যখন আমাদের শাদি হয়, তখন ঘর, পরিবার ও সন্তানদের দায়িত্ব আমাদের উপর আসে। সেই সময় আমরা কীভাবে ওয়াকিফাত-ই-নও হিসেবে আমাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারি?চ

এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর আনওয়ার বলেন: "সঠিক পথ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। যদি তাহাজ্জুদ পড়তে পারো তাহলে পড়ো। কুরআন শরীফ পড়ো এবং তার অনুবাদ পড়ো। যদি লজনার কোনো কাজ তোমার উপর অর্পিত হয় তাহলে যতটুকু সম্ভব পালন করো। তারপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সন্তানদের এমনভাবে লালন-পালন করা যাতে তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তোমার স্বামীকে বোঝাও যে, আমি ওয়াকিফাহ-ই-নও এবং আমার দায়িত্ব হলো নিজের সংস্কার করা, ঘরের সংস্কার করা এবং সন্তানদের তালীম দেওয়া। অতএব তুমিও এতে আমাকে সাহায্য করো। কারণ যদি স্বামী/পিতা সন্তানদের লালন-পালনে তার ভূমিকা না পালন করেন, তাহলে সন্তানদের তালীম সঠিক হয় না। সুতরাং সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ঘরের, এবং তোমাদের জন্য এটিই বড় সওয়াবের কাজ।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "হাদিসে আছে, এক নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন: 'আমাদের স্বামীরা উপার্জন করেন, জিহাদে যান, চাঁদা দেন এবং অনেক কাজ করেন যা পুরুষেরা বাইরে করে। আমরা নারীরা ঘরে বসে সেসব কাজ করতে পারি না। তাহলে কি জিহাদ ও চাঁদা দেওয়ার সওয়াব আমরাও পাব?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'হ্যাঁ, পাবে। কারণ তোমরা তাদের ঘরের ভালোভাবে দেখাশোনা করো, সন্তানদের লালন-পালন করো এবং তাদের অনুপস্থিতিতে সন্তানদের দেখাশোনা করো। আর যে নেক নস্ল তৈরি হচ্ছে, তার কারণে তোমরাও সমান সওয়াব পাবে।' এছাড়া তোমরা ধৈর্যের সাথে স্বামীদের পাঠাও যে, 'যাও, দ্বীনের খিদমত করো।' আর যদি স্বামী দুনিয়ার খিদমত করে দ্বীনের না-ও করে, তাহলে হাদিসে আছে যে, নারী ঘরের রক্ষক।"

"সুতরাং ওয়াকিফাহ-ই-নও-এর দায়িত্ব হলো নতুন প্রজন্মকে আহমদিয়্যাতের উপর কায়েম করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা।"

একজন মেয়ে প্রশ্ন করেন: "যখন আমরা স্কুলে যাই, তখন কোন বয়স থেকে মাথায় স্কার্ফ পরা উচিত?

এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর আনওয়ার বলেন: "যখন তুমি পাঁচ বছরের হও, তখন লেগিংস ছাড়া ফ্রক পরা উচিত নয়। তোমার পা ঢাকা থাকা উচিত, যাতে তোমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগে যে, ধীরে ধীরে আমাদের পোশাক ঢাকা থাকা উচিত। স্লিভলেস ফ্রক পরা উচিত নয়। তারপর যখন তোমার ছয়-সাত বছর বয়স হয়, তখন লেগিংস পরে স্কুলে যাও। আর যখন দশ বছরের হও, তখন ছোট স্কার্ফ পরার অভ্যাস গড়ে তোলো। আর যখন এগারো বছরের হও, তখন পুরোপুরি স্কার্ফ পরো। এখানেও লোকেরা শীতে স্কার্ফ পরে। ঠান্ডা লাগলে কান ইত্যাদি ঢেকে নেয় - সেটাও স্কার্ফই।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "কিছু মেয়ে দশ বছর বয়সেও ছোট দেখায়, আবার কেউ দশ বছর বয়সে বারো বছরের মেয়ের মতো দেখায় - লম্বা হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক মেয়েকে নিজের দিকে দেখতে হবে: যদি বড় দেখায় তাহলে স্কার্ফ পরা উচিত। ছোট বয়স থেকেই স্কার্ফ পরার অভ্যাস গড়ে তোলো, তাহলে লজ্জা লাগবে না। নয়তো সারা জীবন লজ্জায় থাকবে। যদি তুমি বলো যে বারো, তেরো বা চৌদ্দ বছর বয়সে স্কার্ফ নেব, তাহলে সবসময় চিন্তা করবে এবং লজ্জা লাগবে। তারপর বলবে, 'এখন যদি স্কার্ফ নিই তাহলে মেয়েরা হয়তো আমার মজা উড়াবে এবং হাসবে।' তাই সাত, আট, নয় বছর বয়স থেকেই মাঝে মাঝে স্কার্ফ পরা শুরু করো। অন্য মেয়েদের সামনেও পরো যাতে তোমার লজ্জা চলে যায়। আর যখন বড় দেখাবে তখন পুরোপুরি স্কার্ফ নাও - তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।"

"অবশ্যই বড় মেয়েদের জানা উচিত যে, পর্দার উদ্দেশ্য হলো হায়া (লজ্জা-শরম)। ইউরোপীয়রা বা যারা ওয়েস্টার্ন প্রভাবে আছে, তারাও পুরনো দিনে লম্বা পোশাক পরত - লম্বা ম্যাক্সি ফ্রক। এখন তো তারা প্রায় নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রশ্ন হলো: পুরুষকে তখনই ভালো সাজে বলা হয় যখন সে পুরো ট্রাউজার, কোট ও টাই পরে, আর নারীকে বলা হয় তুমি তখনই ভালো সাজে যখন মিনি স্কার্ট পরো।"

হুজুর আনওয়ার বলেন: "আমার কাছে তাদের এই দর্শন বোধগম্য হয়নি। তাই পুরুষদের দিকে তাকিয়ো না। নারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে নগ্ন করে অপমানিত করে। সুতরাং একজন আহমদী মেয়ে ও আহমদী নারীর মর্যাদা তার হায়া বজায় রাখার মধ্যেই। আসল জিনিস হলো হায়া, আর এই হায়াই অন্যদেরকে তোমার দিকে খারাপ দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত রাখে।"

একজন ওয়াকিফাহ-ই-নও প্রশ্ন করেন: "যখন সন্তান পেটে থাকে, তখন নারীকে কী দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক বানান?চ

এই প্রশ্নের জবাবে হুজুর আনওয়ার বলেন: "এজন্য দোয়া করা উচিত যে, যে সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে, আল্লাহ তাকে নেক ও সালেহ বানান, দ্বীনের উপর কায়েম রাখুন, সুস্থ রাখুন, কোনোভাবেই যেন আমাকে, পরিবারকে বা জামাতকে শর্মিন্দা না করে এবং দ্বীনের উপর কায়েম থাকে। যেমন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মা দোয়া করেছিলেন: 'আমার পেটে যা আছে আমি তাকে আল্লাহ তা'আলার নজর করছি।' নজর করার অর্থ হলো: আমি দোয়া করছি যে, এই সন্তান আল্লাহর আদেশ অনুসারে চলবে, সেগুলো অনুসারে আমল করবে, নেকীর উপর কায়েম থাকবে - আমি তাকে তোমার দ্বীনের জন্য সোপর্দ করছি।"

"সুতরাং এই চেষ্টা করো। এই দোয়া করো যে সন্তান দ্বীনের উপর কায়েম থাকুক। এইমাত্র ছেলেদের ক্লাসে হযরত আকদাস মসীহ মাউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর একটি উক্তি পড়া হয়েছিল: 'দ্বীন অর্জনের চেষ্টা করলে দুনিয়া নিজেই চলে আসবে।' যারা দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকে তারা সামান্য কিছু উপার্জন করে কিন্তু সবসময় চিন্তায় থাকে। তাদের সবসময় এই চিন্তা থাকে যে এখন এত টাকা কম হয়ে গেল, এত বেশি হয়ে গেল, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে গেল। আজ ব্লাড প্রেশার হয়ে গেল, আজ শর্করা বেড়ে গেল। তাদেরও সবসময় চিন্তা লেগেই থাকে।"

মির্জা মসরুর আহমদ বলেন: আমি একজন হিন্দু ব্যক্তিকে চিনতাম। তিনি কুনরিতে থাকতেন। তিনি মানুষকে টাকা ধার দিতেন এবং সেই ঋণের সুদ বহুগুণ বেড়ে যেত। ঋণের জামানত হিসেবে মানুষ নারীদের সোনার গয়না তাঁর কাছে রেখে যেত। এভাবে তিনি প্রচুর পরিমাণে সোনা জমা করেছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর বাড়িতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনা পড়ে থাকত।

তিনি এই সোনা ব্যাংকে রাখতেন না, কারণ তাঁর ভয় ছিল যে ব্যাংকের লোকেরা কোনো না কোনোভাবে তা নিয়ে নিতে পারে। পরিবর্তে তিনি মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ে এক ধরনের সিন্দুক তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি সোনা রেখে দিতেন। তিনি তার উপর নিজের চারপাই (খাট) পেতে সেখানে শুয়ে থাকতেন, যাতে রাতে চোর এসে না নিয়ে যায়। তিনি রাতে বেশ কয়েকবার জেগে উঠতেন এই চিন্তায় যে সোনা এখনও আছে কি না।

একদিন এই অবিরাম উদ্বেগের কারণে যে কেউ সোনা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, তিনি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সোনা ঠিক সেখানেই পড়ে ছিল। তাঁর ছেলে স্বভাবগতভাবে কিছুটা ভোগবিলাসী ও অপব্যয়ী ছিল। সে সোনা বের করে দুনিয়াবি বিলাসিতায় খরচ করতে থাকে, যতক্ষণ না সমস্ত সোনা শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরও এতে কোনো প্রকৃত উপকার হয়নি।

সুতরাং, সন্তানের জন্য কী দোয়া করা উচিত সে সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে: সন্তান যেন নেক ও ধার্মিক হয় সে দোয়া করতে হবে। দোয়া করতে হবে যেন সন্তান এমন ব্যক্তি হয় যাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন। এটাই দোয়া হওয়া উচিত এবং সেই অনুসারে সন্তানকে লালন-পালন করতে হবে।

এক ওয়াকফ-ই-নও মেয়ে তখন প্রশ্ন করেন: "রমজানে যখন আমরা রোজা রাখি, তখন কোন বয়স থেকে রোজা রাখা শুরু করা উচিত?

এর জবাবে হুজুর আনওয়ার বলেন: তোমাদের উপর রোজা ফরজ হয় যখন তোমরা পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হও। যদি তুমি ছাত্রী হও এবং তোমার পরীক্ষা চলছে, আর সেই সময় তোমার বয়স তেরো, চৌদ্দ বা পনেরো বছর হয়, তাহলে রোজা রাখবে না। তবে যদি পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তুমি সহ্য করতে পারো, তাহলে ঠিক আছে।

কিন্তু সাধারণভাবে সতেরো কিংবা আঠারো বছর বয়সে বা তার পরে ফরজ রোজাগুলো অবশ্যই রাখতে হবে। তখন তা ফরজ হয়ে যায়। আট, দশ বছর বয়সে যদি উৎসাহবশত দু'একটা, তিন-চারটা বা পাঁচটা রোজা রাখতে চাও, তাহলে রাখতে পারো, কিন্তু সেগুলো ফরজ নয়। ফরজ হয় যখন তুমি বড় হয়ে সেগুলো সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করো।

এরপর ১২ পাতায়..

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

মক্কা, কাবা ও কুরাইশ

কিন্তু কেবল একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কুসাই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মক্কার শাসক এবং কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজের ন্যায্য উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ধীরে ধীরে নিজের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন।

খুযাআহ গোত্রের লোকেরা যখন এ বিষয়টি উপলব্ধি করল, তখন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কুসাইও নিজের সমর্থকদের একত্রিত করেন। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অবশেষে এই শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, একজন নিরপেক্ষ সালিস নিযুক্ত করা হবে এবং উভয় পক্ষ তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

সালিস হিসেবে আমর ইবনে আওফ নামক একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি রায় দেন যে, কাবার তত্ত্বাবধানের প্রকৃত অধিকার কুসাইয়েরই। আর খুযাআহ গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের জন্য কোনো রক্তপণ (দিয়া) প্রদান করা হবে না। তবে কুসাইয়ের পক্ষের নিহত ব্যক্তিদের জন্য তাঁর গোত্রকে রক্তপণ প্রদান করতে হবে।

এভাবে দীর্ঘকাল পর কাবার তত্ত্বাবধান পুনরায় হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের (বনী ইসমাঈল) কাছে ফিরে আসে।

কাবার তত্ত্বাবধান কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্বই ছিল না; এটি ছিল পার্থিব মর্যাদা, সম্মান ও রাজনৈতিক ক্ষমতারও একটি বড় উৎস। কারণ যে গোত্র কাবার তত্ত্বাবধান করত, সমগ্র আরবের মানুষ তাদের বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

ফলে কাবার তত্ত্বাবধান লাভের মাধ্যমে কুরাইশ গোত্র সমগ্র আরবে অসাধারণ মর্যাদা, প্রতিপত্তি এবং উচ্চ অবস্থান অর্জন করে।

কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ

পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষয় ও জীর্ণতার অধীন। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রাথমিক নির্মাণের পর কাবা ঘর বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পুনর্নির্মিত হয়েছে।

কখনো মক্কার উপত্যকায় সংঘটিত বন্যার প্রবল স্রোতে এর কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তখন এর তত্ত্বাবধায়কেরা পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করতেন। আবার কখনো অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনো দুর্যোগের কারণে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিত। ফলে কাবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা প্রত্যেক গোত্রকেই কোনো না কোনো সময়ে এর পুনর্নির্মাণের কাজ করতে হয়েছে। বনী জুরহুম, খুযাআহ এবং কুরাইশ-প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধানকালে কাবা পুনর্নির্মাণ করেছিল।

কুসাই ইবনে কিলাবও একবার কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। পরে মহানবী (সা.)-এর যুগে কুরাইশরা আবার কাবা পুনর্নির্মাণ করে এবং এতে কিছু পরিবর্তন আনে। তারা এর উচ্চতা বৃদ্ধি করে, ছাদ নির্মাণ করে, ভেতরে ছয়টি স্তম্ভ স্থাপন করে, ছাদে একটি আলোক-ছিদ্র (স্কাইলাইট) তৈরি করে এবং কাবার দরজা উঁচু করে দেয়।

কিন্তু তাদের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত ছিল। তাই তারা কাবাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ভিত্তির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করতে পারেনি। বরং এক পাশের প্রায় সাত হাত পরিমাণ জায়গা নির্মাণের বাইরে রেখে দেয়। এই বাদ পড়া অংশকে হাতীম বা হিজর বলা হয়।

মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, হাতীম কাবা ঘরেরই অংশ। এজন্য তাওয়াফ করার সময় এই অংশের বাইর দিয়ে চক্কর দেওয়া আব শ্যক।

একবার মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন-

"হাতীম কাবা ঘরেরই অংশ। কুরাইশদের অর্থের অভাব হয়েছিল বলে তারা এটিকে বাইরে রেখে দেয়। তারা কাবার দরজাও উঁচু করেছিল, যাতে যাকে ইচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা দিতে পারে। হে আয়েশা! তোমার জাতি যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী না হতো এবং আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে এতে তারা কষ্ট পাবে, তবে আমি তাদের নির্মিত এই কাঠামো ভেঙে কাবাকে ইবরাহীমী ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করতাম। আমি হাতীমকে এর অন্তর্ভুক্ত করতাম, দরজাকে নিচু করতাম এবং বর্তমান দরজার বিপরীত দিকে আরেকটি দরজা স্থাপন করতাম।"

অতঃপর ৬৪ হিজরিতে, কোনো এক কারণে যখন কাবার কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মক্কার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। তিনি কাবাকে পুনর্নির্মাণ করেন এবং ছয়টির পরিবর্তে ভেতরে মাত্র তিনটি স্তম্ভ রাখেন।

কিন্তু পরে 'আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান' মক্কার নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে-সম্ভবত এই মনে করে যে মহানবী (সা.) নিজে যেহেতু এ কাজ করেননি, তাই অন্য কারোও তা করার অধিকার নেই-তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-কে নির্দেশ দেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নির্মিত কাঠামো ভেঙে ফেলার এবং মহানবী (সা.)-এর যুগের কাঠামোর অনুরূপ করে পুনর্নির্মাণ করার।

হাজ্জাজ সেই নির্দেশ পালন করেন। তবে তিনি তিনটি স্তম্ভের পরিবর্তনটি বহাল রাখেন।

কাবার গিলাফ (কিসওয়া)

প্রথম যুগে কাবা ঘরের ওপর কোনো আবরণ বা কাপড় ছিল না। পরবর্তীকালে ইয়েমেনের এক রাজাতুব্বা আসআদ একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি কাবার ওপর একটি আবরণ পরিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তিনি বাস্তবেও কাবার ওপর একটি গিলাফ পরিয়ে দেন। সেই থেকেই কাবাকে আবৃত করার প্রথা চালু হয়।

পরবর্তীকালে কুরাইশরাও নিয়মিতভাবে কাবার ওপর গিলাফ পরাত।

ইসলামের যুগেও এই প্রথা অব্যাহত থাকে। আজও প্রতি বছর কাবা ঘরের জন্য একটি নতুন, মূল্যবান গিলাফ প্রস্তুত করা হয় এবং তা কাবার ওপর পরানো হয়। পুরোনো গিলাফটি খুলে ফেলা হয় এবং তা হাজীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় অথবা বিক্রি করা হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত গিলাফের রং কালো। এর বিভিন্ন স্থানে 'কালিমায়ে তাইয়্যিবা' এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত সুদৃশ্যভাবে অঙ্কিত ও সূচিকর্ম করা থাকে।

'কাবার পবিত্রতা'

জাহিলিয়াতের যুগে আরবদের অন্তরে কাবার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তা সম্ভবত আজ মুসলমানদের হৃদয়ে বিদ্যমান শ্রদ্ধার চেয়েও বেশি ছিল। তারা কাবাকে প্রায় এক প্রকার উপাস্যের মর্যাদা দিত এবং এর উদ্দেশ্যে কোরবানি ও উপঢৌকন নিবেদন করত। এসব নিবেদন কাবার প্রয়োজন, এর খাদেমদের ব্যয় এবং হজযাত্রীদের সেবার জন্য ভূগর্ভস্থ এক ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হতো।

কাবা নিজেই ছিল একটি 'হারাম' (পবিত্র আশ্রয়স্থল)। এর কারণে শুধু মক্কা নয়, এর আশপাশের অঞ্চলও 'হারাম' হিসেবে ঘোষিত ছিল, যেখানে সব ধরনের হত্যা ও রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। 'আশহুরুল হুরুম' (চারটি পবিত্র মাস)-এর বিশেষ মর্যাদাও কাবাকেই কেন্দ্র করে ছিল, যাতে হজযাত্রীরা পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে, কোনো ভয় বা বিপদ ছাড়াই হজ পালনের জন্য আসতে পারেন।

আরও একটি প্রথা ছিল যে, কোনো বস্তুকে বিশেষ পবিত্রতা বা সম্মান প্রদর্শন করতে হলে তা কাবার গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এজন্যই জাহিলিয়াত যুগের সাতটি বিখ্যাত কবিতাকে 'সাব' মুআল্লাকাত' (সাতটি ঝুলন্ত কাব্য) বলা হতো; কারণ সেগুলো কাবার গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

কাবার চারপাশে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে কুসাই বিন কিলাব-এর সময় পর্যন্ত কোনো গোত্রই কাবার নিকটে স্থায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণ করেনি। বরং তারা কাবা থেকে কিছু দূরে অস্থায়ী বাসস্থান ও তাঁবুতে বসবাস করত। কিন্তু কুসাইয়ের উদ্যোগে তঁৎধুংয কাবার চারদিক ঘিরে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, এবং এভাবেই মক্কা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নগরীতে পরিণত হয়।

এই ঘরগুলো কাবার গায়ে লাগিয়ে নির্মাণ করা হয়নি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কাবার চারপাশে পর্যাপ্ত খোলা স্থান রাখা হয়েছিল, যাতে হজযাত্রীরা *তাওয়াফ* (কাবা প্রদক্ষিণ) করতে পারেন। এই খোলা স্থানটিই মূলত মসজিদুল হারাম-এর সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছিল।

রাশেদীন খলীফার-এর যুগে এই স্থান সংকীর্ণ বলে অনুভূত হতে শুরু করে। ফলে আশপাশের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয় এবং মসজিদুল হারাম-এর প্রাঙ্গণ সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমান কাবা ও মসজিদুল হারামের বিন্যাস নিম্নরূপ:

কাবা ও মসজিদে হারাম-এর মানচিত্র

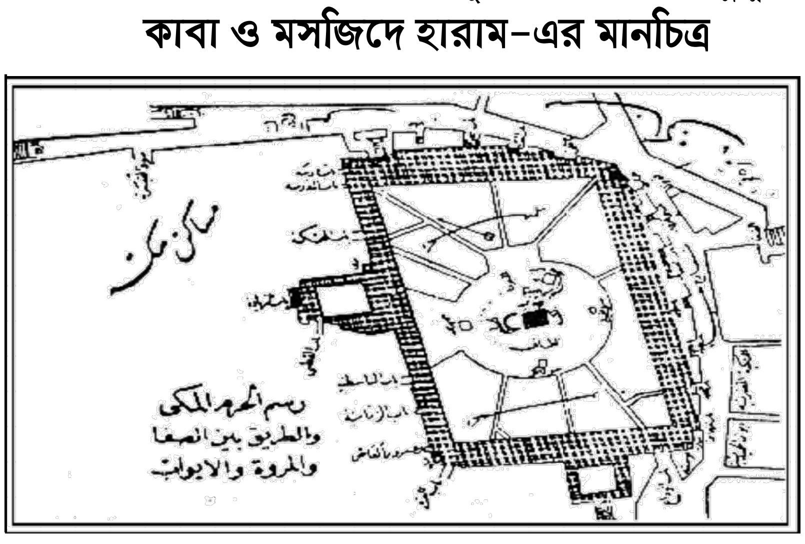

এই পরিকল্পনায় কাবার চারপাশে যে সাদা অংশ দেখানো হয়েছে, সেটিই 'মাতাফ'-অর্থাৎ সেই স্থান যেখানে 'তাওয়াফ' (কাবা প্রদক্ষিণ) করা হয়।

মাতাফের চারপাশে কালো রেখা দিয়ে যে অংশ দেখানো হয়েছে, তা নামাজ আদায়ের স্থান নির্দেশ করে। এর সঙ্গে চারদিক জুড়ে সংলগ্ন রয়েছে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (সাহন), যেখানে বিভিন্ন স্থানে কালো রেখার মাধ্যমে চলাচলের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে ঘিরে রয়েছে মসজিদের বেষ্টনীর ছাদযুক্ত অংশ, যা 'কুব্বা' আচ্ছাদিত বারান্দা বা খিলানযুক্ত করিডর) নামে পরিচিত। কাবাএবং মসজিদে হারাম-এর সামগ্রিক স্থাপত্যে এই অংশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028

Vol-11 Thursday, 18 June, 2026 Issue No.25

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুজুর আনওয়ার তখন জিজ্ঞাসা করেন: “এখানে সেহরি ও ইফতারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?

হুজুরকে জানানো হয় যে, শীতকালে প্রায় বারো ঘণ্টা, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রায় উনিশ ঘণ্টা।

এতে হুজুর আনওয়ার বলেন: তাহলে উনিশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা তোমাদের জন্য অনেক বেশি। যুক্তরাজ্যে সাম্প্রতিক রোজাগুলো প্রায় আঠারো ঘণ্টা থেকে আঠারো ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের মতো ছিল। সুইডেনের মতো দেশে কোনো কোনো এলাকায় রোজা বাইশ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। এমন জায়গায় সমন্বয় করতে হয়, কারণ এত লম্বা রোজা সবসময় সাধারণ নিয়মে রাখা যায় না।

লম্বা রোজা সহ্য করার ক্ষমতা তখন আসে যখন তুমি বড় ও শক্তিশালী হয়ে যাও। অন্তত সতেরো-আঠারো বছর বয়স হলে তা উপযুক্ত। তারপর থেকে রোজা রাখবে।

হুজুর আনওয়ার আরও বলেন: দশ-এগারো বছর বয়সে শিশুরা অভ্যাস গড়ার জন্য দু’-তিনটি রোজা রাখতে পারে। প্রতি রমজানে ছোট শিশুরাও যেন অনুভব করে যে রমজান এসেছে। আর যদি তারা রোজা না-ও রাখে, তবুও সকালে উঠবে। মা-বাবার সাথে সেহরি খাবে, নফল নামাজ পড়বে এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করবে।

তোমাদের জন্য রমজান এটাই হওয়া উচিত। ছাত্রী ও তরুণী মেয়েরা রমজানে উঠবে এবং অবশ্যই সেহরি খাবে। সেহরির আগে দু’রাকাত বা চার রাকাত নফল নামাজ পড়বে। তারপর নিয়মিত নামাজ আদায় করবে এবং কুরআন শরীফ নিয়মিত তিলাওয়াত করবে।

ওয়াকফাত-ই-নও বালিকাদের ক্লাস রাত নয়টায় শেষ হয়।

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরুদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার ‘আসতাগফিরুল্লাহ্’

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

সত্যের বাণী প্রচার – প্রত্যেক মোমেনের ঈমানী কর্তব্য

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহতা’লা সৃষ্টির সূচনাতেও বলেছিলেন যে, আমি তোমার প্রভু। ঠিক তেমনই শেষ যুগেও তিনি বলেন,‘আনাল মওজুদ’ (তথা আমি সদা বিরাজমান)।স্মরণ রেখ! তিনি পথ-প্রদর্শক। তিনি যদি লক্ষ্য না রাখেন তাহলে সবাই নাস্তিক হয়ে যাবে। তাই তিনি নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে থাকেন আর বর্তমান যুগে তো এ বিষয়টি বিশেষভাবে আবশ্যক। যে জিনিসের রাজত্ব থাকে তার প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যায়। আজকাল যদি পুণ্যবান ব্যক্তি, যিনি সত্য ও সঠিক পথ লাভ করেছেন, তিনি যদি ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন তাহলে বোঝা গেল, অন্ধকার বা ভ্রষ্টতার রাজত্ব এখনও বিদ্যমান। যখনএমন আবহ চলে তখন সবাই এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায় এবং মু’মিন নিজে রক্ষা পেলেও অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ভ্রষ্টতার প্রতাপএত বেশি যে, যারা বড় বড় শিক্ষিত লোক, তাদের সাথে কেউ ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করতে সাহস পায় না পাছে সে অসন্তুষ্ট হয় অথবা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। কিন্তু সাহাবীদের (রা.) আদর্শ দেখা প্রয়োজন অর্থাৎ ইসলামের দুর্বলতম অবস্থাতেও মহানবী (সা.) সমস্তরাজা-বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেছেন। তখন এতটা সভ্য বা সুশীল যুগও ছিল না আর নিরাপদও ছিল না। সাহাবীরা (রা.) ঐসকল পত্র সরবরাহ করেছেন এবং নিজেদের বিশ্বাস রাজ দরবারে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। একজন খ্রিস্টান বাদশা যখন ইসলামের দাওয়াতসংবলিত পত্র পেলেন এবং সাহাবীদের (রা.) মুখ থেকে ঐশী বাণী শুনলেন তখন অবলীলায় বলে উঠলেন, আপনাদের বাণী শুনে মনে হচ্ছে, যে মহান সত্তা তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, এটি তাঁরই বাণী এবং তিনি আরও বলেন, আমি যদি সেই নবীর কাছে যেতে পারতাম তবে তাঁর (সা.) পদচুম্বন করতাম। পাদ্রীদের ডেকে বলেন, দেখো! ইসলাম কতউন্নতমানের ধর্ম, তোমাদের কাছে এই ধর্ম কি পছন্দনীয়? পাদ্রীদের পক্ষ থেকে তিনি যখন বিরোধিতা অনুভব করলেন তখন বললেন, আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করছিলাম। তারএই দুর্বলতা ছিল জাগতিকতার মোহের প্রতিফল। যে ব্যক্তি জগৎপূজারি নয় সে সত্য বলতে এবং সত্যের বাণী প্রচার করতে ভয় পায় না আর আল্লাহ স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন।

(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ১১৮)

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা’লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল,‘হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir